**চন্ডিপুর ট্রাজেডিঃ**

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে নৃশংস ভাবে গনহত্যা করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত থেকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। ঐদিন রাতে পাকিস্থানী সেনা বাহিনীর ২৭বালুচ রেজিমেন্ট এর ডি কোম্পানী কমান্ডার মেজর সোয়েব সহ সকলে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। তাদের মূল ক্যাম্প ছিল কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে। কুষ্টিয়া জেলার ইপিআর, পুলিশ আনছার ছাত্র জনতার হাতে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী সম্পূর্ন পরাজিত হয়। এবং মেজর সোয়েব সহ সকল সদস্য নিহত হয়। কুষ্টিয়া জেলা সম্পূর্ন স্বাধীন হয় এবং ১৭ দিন এ জেলা পাকহানাদার মুক্ত থাকে। ১৫ই এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পাকহানাদার বাহিনী পাকশি ব্রিজ পার হয়ে পদ্মা নদীর পশ্চিম পারে ভেড়ামারাতে উপস্থিত হয় এবং রাত্রে অবস্থান করে। তাদের লক্ষ ছিল কুষ্টিয়া শহর পূর্নদখল করা। দুইটা গ্রুপে ভাগ হয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী কুষ্টিয়া শহর পূর্নদখলের চুড়ান্ত পরিকল্পনা করে একটি গ্রুপ জিকে ক্যানেল ও রেললাইন ধরে দক্ষিন দিকে মিরপুর-পোড়াদহ হয়ে কুষ্টিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। অপর গ্রুপটি কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা রোড দিয়ে সরাসরি কুষ্টিয়া শহরে প্রবেশ করে। দুই গ্রুপ এর কাজ ছিল দুই পাশ্বের ঘরবাড়ী গানপাউডার দিয়ে পোড়ায়ে দেওয়া ও মানুষ দেখা মাত্র গুলি এবং বড় বড় স্থাপনা সমূহ মর্টার সেল দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া।

**চন্ডিপুর গনহত্যা**

ভেড়ামারা ও আশেপাশের গ্রাম গুলো থেকে লোকজন পূর্বেই নিরাপদ দুরতেব সরে গিয়েছিল। চন্ডিপুর পন্ডিতবাড়ী সদস্যরাও ঐদিন অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল সন্ধায় নিরাপদ দুরতেব চলে যাওয়ার জন্য জিকে ক্যানেল, রেললাইন ও মিরপুর থানা সড়ক পার হয়ে পশ্চিমে চন্দনা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐদিন সন্ধায় নদী পার না হতে পেরে পরদিন সকালের জন্য অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার সকালে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করতে থাকে। এমন সময় সংবাদ পাওয়া যায় পাকহানাদার বাহিনী ভেড়ামারা থেকে পোড়ামাটি নীতি গ্রহন ও চিরুণী অভিযান পরিচালনা করতে করতে দক্ষিন ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং মানুষ দেখামাত্র গুলি ও ঘরবাড়ী গা ন পাউডার দিয়ে পোড়ায়ে দিচ্ছে। উপায়ন্ত না পেয়ে পন্ডিতবাড়ীর লোকজন নদীর তীরে গভীর বন জঙ্গলে ঢাকা একটি গর্তে আশ্রয় গ্রহন করে। পাক মিলিটারী ঝোপঝাড় তল্লাশী করতে করতে গর্তের কাছে এসে হাজির হয় এবং পৌশাচিক আনন্দে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। মুহুত্বের ভিতরে ১৪টি তাজা প্রান মৃত্যর কোলে ঢলে পড়ে। মৃত্য নিশ্চিত জেনে মিলিটারিগন সেখান থেকে চলে যায়। পন্ডিতবাড়ীর ঐ দলে ২০/২২ জন লোক ছিল। এর মাঝে মাত্র কয়েকজন আহত ও গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে এখনও ৪ (চার) জন জীবিত আছেন।

১৪ শহীদ ও ৫ জন যুদ্ধাহতদের নাম

যারা এ গনহত্যায় শহীদ হয়েছিলেন তারা হলেন

1. শহীদ শফিউদ্দিন, পিতা:- মৃত ফতেহ আলী।

2. শহীদ মশিউর রহমান, পিতা:- শহীদ শফিউদ্দিন।

3. শহীদ মীর রাবেয়া খাতুন, স্বামী:- মৃত মীর আবুল হোসেন।

4. শহীদ মীর ডায়মন্ড, পিতা:- মৃত মীর আবুল হোসেন।

5. শহীদ মীর আক্তারুজ্জামান, পিতা:- মৃত মীর আবুল হোসেন।

6. শহীদ মীর নুতন, পিতা:- মৃত মীর আবুল হোসেন।

7. শহীদ মিস নীলা, পিতা:- আব্দুস ছাত্তার।

8. শহীদ জালালউদ্দিন, পিতা:- মীর ফকির আহম্মেদ।

9. শহীদ মীর সহিদা বেগম রুমি, পিতা:- মীর ফকির আহম্মেদ।

10. শহীদ মীর নবীণ, পিতা:- শহীদ জালালউদ্দিন।

11. শহীদ জাহেদা খাতুন, স্বামী:- মো: দলিল উদ্দিন।

12. শহীদ সেলিনা খাতুন, পিতা:- মো: দলিল উদ্দিন।

13. শহীদ ফাতেমা খাতুন, স্বামী:- মো: আতিয়ার রহমান।

14. শহীদ ছদরুল ইসলাম, পিতা:- মৃত শামসুদ্দিন।

যারা আহত হয়েছিলেন এবং বর্তমানে জীবিত আছেন

1. আহত মোছা: সাজেদা বেগম, স্বামী:- শহীদ মীর জালালউদ্দিন।
2. 2. মোছা: আফরোজা বেগম, পিতা:- মো: আতিয়ার রহমান।

3. মোছা: মায়া খাতুন, পিতা:- শহীদ শফিউদ্দিন।

4. মো: আমির খসরু, পিতা:- মো: আতিয়ার রহমান।

পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর হাতে চন্ডিপুর ট্রাজেডিতে পন্ডিতবাড়ীর বৃদ্ধ যুবা, শিশু, মহিলা এমনকি সদ্য ভুমিষ্ঠ সন্তান শহীদ নবীব (বয়স-দুই দিন) বাচঁতে পারে নাই। দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার, রাজাকার, আলবদর, আল সামস্ বাহিনীর নৃশংসতায় এ রকম লক্ষ লক্ষ শহীদ এর রক্ত, অঙ্গহানী ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় স্বাধিনতা। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কুষ্টিয়া জেলা ইউনিট কমান্ড জেলাতে ঐ সকল শহীদের খুজে বের করে তাদের আত্মত্যাগের কাহিনীটুকু নুতন প্রজন্মেও কাছে তুলে ধরতে চাই। এ জন্যই যে, ‘‘স্বাধিনতা’’ এই কথাটার জন্য কত হাজার লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে। তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় স্বাধিনতা। চন্ডিপুর গনহত্যায় শহীদদের জন্য স্বাধিনতার দীর্ঘ ৪২ বৎসর পর জেলা ইউনিট কমান্ড এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও জেলা পরিষদ কুষ্টিয়া এর অর্থায়নে সর্বপরি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রশিদুল আলম সাবেক সংস্থাপন সচিব এর অনুপ্রেরনায় নির্মিত হয়েছে ছোট একটি স্মৃতিস্তম্ভ যা যুগে যুগে কালে কালে এ দেশের মানুষকে মনে করিয়ে দিবে এ জাতির স্বাধিনতার জন্য তার পূর্ব পুরুষেরা কিভাবে অকাতরে জীবন দিয়ে গেছেন।

হাডিং ব্রীজ বধভূমি

১।বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আলম জাকারিয়া টিপু

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

২।মো: হাবিবরে রহমান

মুক্তি যোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্য

৩।মো: আমির খসরু

মুক্তিযদ্ধে প্রত্যেক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী

ব্যাংক কর্মকর্তা

৪।মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

প্রধান শিক্ষক

তাহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৫।মো: জুবের আলম

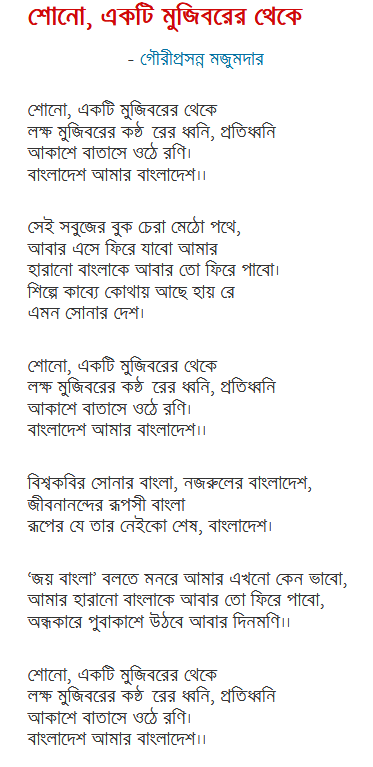
সহকারী শিক্ষক

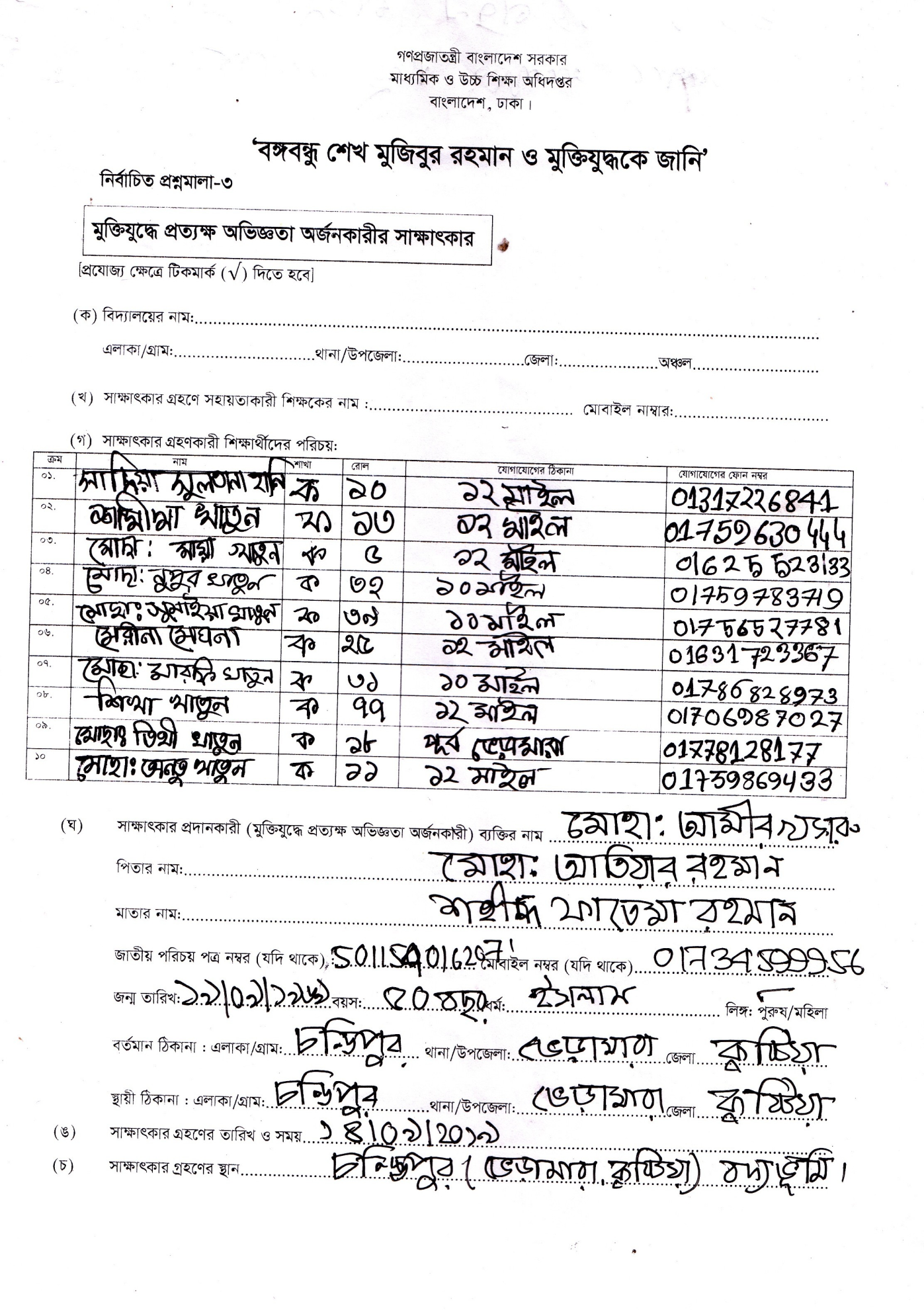
৬। মো: জামারুল ইসলাম

সহকারী প্রধান শিক্ষক

৭। উম্মে ফাতেমা আখতার, সহকারী শিক্ষক

৮।মোছা: লতিফা ফেরদৌস, সহকারী শিক্ষক





শোন একটি মুজিবরের থেকে,লক্ষ মুজিবরের কন্ঠস্বরের ধাবনি-প্রতিধ্বনি। বর্তমান প্রজন্ম কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি, অংশ হিসেবে তাহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীগন ভেড়ামারা উপজেলার সন্মুথ যুদ্ধের অংশ হাডিং ব্রীজ নিছে বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্র এবং বর্ধভুমি পরিদর্শন করেন । যুদ্ধের স্মৃতি চারন করেন বীর মুক্তি যোদ্ধা ভেড়ামাা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলহাজ্জ বীর মুক্তি যোদ্ধা আলম জাকারিয়া টিপু এবং আহত, সজন হারা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যাক্তিত্ব ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব আমির খসরু , যার পরিবারের ১৪জন শহীদ হয়ে ছিল । ১২ এপ্রিল,১৯৭১ তারিখে মহান মুক্তি যুদ্ধে সুচনা লগ্নে বীর মুক্তি যোদ্ধা ও তৎকালিন ইবিআর ১টি দল সরা সরি সন্মুখ যুদ্ধ অবর্তীণ হয়। তার মধ্যে নিম্ন বণিত বীর মুক্তি যোদ্ধাগনসহ আরও নাম না জানা অনেকেই যুদ্ধ শহীদ হন।

১। শহীদ আফিলুদ্দিন (ইপিআর)

২। শহীদ হিরণ মিয়া (ইপিআর)

৩। শহীদ নজরুল ইসলাম

৪। শহীধ গিয়াস উদ্দীন

৫। শহীদ সোহরাফ উদ্দীন

আসুন আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানি । ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশে যত বধ্যভূমি আছে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার চণ্ডিপুর বধ্যভূমি তার একটি। ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ এখানে একই দিনে একই পরিবারের ১৪ জন শহীদ হন এবং চার জন আহত হন । কুষ্টিয়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ঘটনার মধ্যে এটি একটি। পরিবারটি হল পন্ডিত পরিবার । শহীদের তালিকায় লেখা শেষ শহীদ সদরুল ইসলাম। শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনের সময় যিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আমার শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব আমির খসরু। তার মা (শহীদ ফাতেমা খাতুন, ) শহীদ হয়েছেন । দেশের জন্য আত্মত্যাগী পরিবারটির জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করি।

**কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস**

১৯৭১ সমসাময়িক উত্তাল বাংলাদেশের ঢেউ বেশ ভালোভাবেই আছড়ে পড়ে কুষ্টিয়াতে। ১৯৭১ এ এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলার ভূমিকা ছিল নেতৃস্থানীয়। আমরা আমাদের প্রবন্ধ শুরুর সময়কাল হিসেবে বেছে নিয়েছি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসকে।

১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ মাঠে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় লাল সবুজের ছয়টি তারা খচিত একটি পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসাবে উড়িয়ে দেন কুষ্টিয়া জেলা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ও জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আব্দুল জলিল। স্বাধীন বাংলার ইশতেহার পাঠ করেন কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ও স্বাধীন বাংলা সেলের নেতা শামসুল হাদী। মারফত আলী, আব্দুল মোমেন, শামসুল হাদীর নেতৃত্বে গঠিত হয় জয়বাংলা বাহিনী। ২৩শে মার্চ কুষ্টিয়া হাইস্কুল মাঠে পূনরায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য(এমপিএ) গোলাম কিবরিয়া ও আব্দুর রউফ চৌধুরী জয়বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। কুষ্টিয়ার প্রতিটি গ্রামে জয় বাংলা বাহিনী গঠিত হয়।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ রাত পৌনে বারোটায় মেজর শোয়েবের নেতৃত্বে এবং ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ ও লেঃ আতাউল্লাহ শাহ এর উপঅধিনায়কত্বে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের ডি কোম্পানীর ২১৬ জন সৈন্য কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন আক্রমন করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করে। ডিউটিরত পুলিশেরা অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে নদী পার হয়ে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পুলিশ লাইন, জেলা স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, থানা ও আড়ুয়াপাড়া ওয়ারলেস অফিসে অবস্থান নেয়। তাদের কাছে M.M.R.R, S.M.G, L.M.G, H.M.G, অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ ছিল ।

২৬শে মার্চ সমস্ত শহরে ২৪ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারি করে পাক সেনারা শহরময় টহল দিতে থাকে। পরদিন ২৭ মার্চ বিকেলে ভাষা সৈনিক জনাব নজম উদ্দিন আহম্মেদ এর শ্যালক রনি রহমান হানাদারদের উপর বোমা আক্রমন করতে উদ্যত হলে শহীদ হন। ২৮শে মার্চ কারফিউ ভঙ্গের পর কুষ্টিয়া পৌর বাজারের জনারণ্যে পাকসেনাদের নির্মম গুলিবর্ষণে বহুলোক আহত হয় ।

তৎকালীন এমএনএ আজিজুর রহমান আক্কাস, এমপিএ আব্দুর রউফ চৌধুরী, খন্দকার শামসুল আলম, এম এ বারী, অধ্যাপক নুরুজ্জামান, আনোয়ার আলী, আব্দুল মোমেন, শামসুল হাদী কুষ্টিয়ায় পাক আর্মির অবস্থান, সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সাম্ভব্য আক্রমনের একটি নকসা তৈরি করে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও দৌলতপুর ইপিআরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আব্দুর রউফ চৌধুরীর নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মাঙ্গন মিয়া সহ আরো কয়েকজন সেনা সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন।

কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দের নকসার উপর ভিত্তি করে ২৮শে মার্চ রাতে চুয়াডাঙ্গায় ইপিআর সেক্টর মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর সঙ্গে কুষ্টিয়া আক্রমনের পরিকল্পনায় সিন্ধান্ত হয় ২৯শে মার্চ ভোর ৪টায় চারদিক থেকে কুষ্টিয়া আক্রমন করার। কথা থাকলেও ইপিআর বাহিনী সময়মত যথাস্থানে পৌছাতে না পারায় ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায় যুদ্ধ শুরু হয়।

সুবেদার মোজাফ্‌ফরের নেতৃত্বে একদল ইপিআর আনসার পুলিশ বাহিনীর সদস্যগন ও জয় বাংলা বাহিনীসহ ছাত্র জনতা পুলিশ লাইন সংলগ্ন জজ সাহেরের বাড়ী ও আশে পাশে অবস্থান নেন।

ট্রাফিক মোড়ে রউফ চৌধুরির বাড়ী হতে থানা ও টেলিফোন এক্সচেন্জ অফিসে হানাদার বাহিনীর অবস্থানে আক্রমন করার জন্য জাহেদ রুমী, শামসুল হুদা সহ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের ছেলেরা এবং ২৫শে মার্চ হরিপুরে আশ্রয় নেয়া পুলিশ সদস্যগণ অবস্থান নেন।

কমলাপুরের অবস্থানরত ইপিআর বাহিনী আড়ুয়া পাড়া ওয়ারলেস অফিসের দক্ষিণপূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থান নেয়। নুর আলম জিকু, আবুল কাশেম ও এ্যাডভোকেট আব্দুল বারী ছাত্র, জনতা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, জয় বাংলা বাহিনী নিয়ে ওয়ারলেস অফিসের দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থান নেন।

ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী, ডিসি (ফুড) সাহেবের বাড়ীতে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায় পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কুষ্টিয়া শহরকে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন করার পর একটি ওপেনিং ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে কুষ্টিয়ার চারদিক থেকে পাক সেনাদের উপর আক্রমন করা হয় ।

তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সামান্য রাইফেল কয়েকটি এল.এম.জি আর অফুরন্ত মনোবল অদম্য সাহস ও দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। হাজার হাজার বাঙালি লাঠি, ফালা, সড়কি নিয়ে সমস্ত কুষ্টিয়া শহর ঘিরে জয় বাংলা ধ্বনি দিতে থাকে। এতে পাকিস্তানী হানাদারদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে পরবতীতে মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমনে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ লাইন, ওয়ারলেস অফিস ও থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। বহু হানাদার সেনা নিহত হয়। অফিসার সহ বেশ কিছু সৈন্য জেলা স্কুলে আশ্রয় নেয় । শুধু জেলা স্কুল বাদে কুষ্টিয়া শহর শক্রমুক্ত হয়। জেলা স্কুল অবরোধ করে রাখে মুক্তি বাহিনী। হানাদাররা যশোর ক্যান্টনমেন্টের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয় । ৩১শে মার্চ একটি বিমান এসে জেলা স্কুলের আশে পাশে এইচ.এম.জির গুলি বর্ষণ করে চলে যায় ।

১লা এপ্রিল ভোরে সব অফিসার সহ ৪০/৫০ জন পাকিস্তানী সেনা একটি ডজ গাড়ি ও দুইটি জিপে উঠে গাড়ির লাইট বন্ধ রেখে পালাতে চেষ্টা করে। গেট থেকে বের হওয়া মাত্র ইপিআরদের ফাঁদে পড়ে প্রথম জীপটির সবাই হতাহত হয় এবং বাকি ২টা গাড়ি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঝিনাইদহ রোড হয়ে এই পলায়ন কালে গাড়াগঞ্জ ব্রিজের মুখে ফাঁদ তৈরি ছিল। তীব্র গতিতে পালিয়ে যাবার সময় ১টি জীপ এই গর্তে পড়ে যায়। সৈন্য সহ মেজর শোয়েব ও অন্য অফিসাররা আহত ও নিহত হয়। ডজ গাড়িটি থামিয়ে অন্যরা আশেপাশের গ্রামে পালিয়ে যেতে চেষ্টাকালে লেঃ আতাউল্লাহ শাহ তার সব সৈন্য সহ গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে এবং ফালা,সড়কি,রামদার আঘাতে আহত ও নিহত হয়।

১লা এপ্রিল বাংলাদেশের মধ্যে কুষ্টিয়া প্রথম শক্রমুক্ত হয়। বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র কুষ্টিয়া জেলা ১৬ দিন শত্রুমুক্ত থাকে। সে কারণে দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ এই জেলাতে আসতে পারেন এবং ১৭ই এপ্রিল সরকারের শপথ গ্রহণ সম্ভব হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে নারীরাও অসীম উদ্দীপনায় এগিয়ে এসেছিলেন।

এই যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৬ জনের পরিচয় জানা যায়।

* হামেদ আলী - পিতা ওমোদ আলী গ্রাম দুধ কুমড়া, কুমারখালী‌
* দেলোয়ার হোসেন -পিতা আলম হোসেন গ্রাম ও থানা মিরপুর ।
* খন্দকার আব্দুর রশিদ -পিতা আব্দুর রহমান গ্রাম বামন পাড়া, মেহেরপুর ।
* ফজলুর রহমান -পিতা নাসির উদ্দিন গ্রাম মেহেরপুর ।
* আশরাফ আলী খান - পিতা হাছেন আলী খান গ্রাম মশান, মিরপুর ।
* গোলাম শেখ - পিতা নজীর শেখ গ্রাম মশান, মিরপুর ।

আব্দূল মোমেন (পিতা আব্দুল করিম কোটপাড়া, কুষ্টিয়া), আনসার আলী (পিতা আজগর আলী গ্রাম চাপাইগাছি, কুষ্টিয়া ) সহ আরো অনেকে আহত হন।

১লা এপ্রিল শক্রমুক্ত হলে ইপিআর বাহিনী পাকসেনাদের ফেলে যাওয়া বেশকিছু অস্ত্র গোলাবারুদ গাড়ি নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় চলে যায়। কুষ্টিয়া মুক্তিবাহিনীর হেফাজতে থাকে। ৩রা এপ্রিল এমএনএ জনাব আজিজুর রহমান আক্কাসের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সভায় এমপিএ জনাব এ্যাডভোকেট আহসানুল্লাহকে আহবায়ক করে “কুষ্টিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ” গঠিত হয়। উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য এম.এ.মজিদকে(বীমা ব্যক্তিত্ত্ব) আহবায়ক করে এমপিএ জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী, আব্দুল জলিল, শামসুল হাদী সহ তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সহযোগীতায় কুষ্টিয়া ডাক বাংলোতে শান্তি শৃঙ্খলা ও বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়।

৩১শে মার্চে পাকসেনারা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া টেলিফোন অফিসের কিছু অংশ ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ৩রা এপ্রিল লন্ডন টাইমসে ফলাও করে কুষ্টিয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় ইতিহাস ছাপা হয় যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিল । চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত কুষ্টিয়াতে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনাদের মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় ।

মানবিক কারনে মুক্তিযোদ্ধারা অবাঙালি ও বিহারীদের কোন ক্ষতি করেনি । নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে জেলখানায় রাখা হয় । এই অবাঙালিরা পরবর্তীতে পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকারদের সঙ্গে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছিল ।

সড়ক ও রেলপথে আক্রমনে ব্যর্থ হয়ে পাকহানাদার বাহিনী আকাশ পথে কুষ্টিয়া আক্রমন করে । ১১ই এপ্রিল পাকিস্তানী বিমান বহর কুষ্টিয়া ও কুমারখালীর উপর হামলা করে । বহু বাঙালি মৃত্যুবরণ করে । ১২ই এপ্রিল পুনরায় বিমান হামলা হলে মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা গুলিবর্ষনে একটি পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান জেলখানার উপর ভেঙ্গে পড়ে বিধ্বস্ত হয় । ১৫ এপ্রিল বিমান বহরের কভারে পাকসেনাদের পদাতিক বাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিশাখালী পর্যন্ত পৌছে আরেক পদাতিক বাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে নগরবাড়ী ঘাট পার হয়ে পাকশি ব্রিজের অপর পাড়ে এসে অবস্থান নেয় । উভয় জায়গাতে মুক্তিবাহিনীর সাথে তুমূল যুদ্ধ হয় । পাকসেনাদের মটার এইচ এমজি সহ অত্যাধুনিক ভারী অস্ত্রের গোলার মুখে মুক্তিবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকহানাদার বাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে ।

১৭ই এপ্রিল পাকিস্তানী বিমান হামলা প্রচন্ড আকার ধারন করে । বিমান বাহিনীর ছত্রছায়ায় পাকবাহিনী ভেড়ামারা-কুষ্টিয়া সড়কের দুই ধারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে । বহু ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তারা শত শত বেসামরিক নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করে কুষ্টিয়া দখল করে।

১৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা কুষ্টিয়া জেলার প্রায় ২০ (বিশ) হাজার মানুষকে হত্যা করে। তারা শুধুমাত্র কুষ্টিয়া শহর থেকেই প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার সম্পদ লুট করে। বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে মে ' ১৯৭১ এর কুষ্টিয়া সম্পর্কে বলা হয়, শহরের প্রায় ৯০ ভাগ বাড়ি, দোকান, ব্যাংক প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে ।

**এই প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন:**

* ইন্তাজ আলী
* আনসার আলী
* হাসান ফয়েজ
* সবুর মিয়া
* সামসুল হুদা
* হামিদ খান এবং আরো অনেকে।

কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর ও যশোর জেলা ৮নং সেক্টর গঠন করা হয়। প্রথমে এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরবতীতে মেজর এম.এ. মঞ্জুর । এ অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিম জোনাল কাউন্সিলের অন্তর্ভূক্ত হয়, যার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন আব্দুর রউফ চৌধুরী। এই কাউন্সিল জনগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিত।

ভেড়ামারায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন অন্যরকম দিন

২৪ মার্চ,১৯৭১ এর এই দিনে ভেড়ামারার মানুষ একটি অন্যরকম দিন কাটিয়েছিল। রাজনীতির সাথে জড়িত অনেকে সেদিন গ্রেপ্তারের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। অজানা আতংক বিরাজ করেছিল সর্বত্র। কারন আগের দিন বিকেলে তারা দুঃসাহসিক একটি কাজ করেছিল।

একাত্তরের তেইশ শে মার্চ বিকেলে ভেড়ামারা হাইস্কুল মাঠে মুক্তিপাগল এলাকাবাসীর অংশগ্রহনে বিশাল একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ভেড়ামারার মাটিতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগের রাতে হাতে সেলাই করে বানানো স্বাধীন বাংলার লাল সবুজ পতাকাটি ভেড়ামারা থানার পাশে মুক্তিযোদ্ধা নজিবুদ্দৌলার বাড়ি থেকে আনা হয় স্কুল মাঠে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন তrকালীন এমএনএ আজিজুল রহমান আক্কাস, এমএলএ জহুরুল হক রাজা মিয়া, এমএলএ আব্দুর রব চৌধুরীসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু কে উত্তোলন করবে সেই পতাকা? এনিয়ে কিছু সময় কেটে যায়। শাসকগোষ্ঠির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবার উপস্থিতিতে সেদিনের পড়ন্ত বিকেলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন ভেড়ামারা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক [Md. Ruhul Islam (হেডস্যার)](https://www.facebook.com/headsir/?__tn__=K-R&eid=ARAmgGcB69_kf_AuRSBYH6KZ4CdGezkZSmY8MLclMePXTm_W3x68qY9UjtQaJ9cq3CYsTQOYMPnLqGWa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdZOpIFJkZk06Uos3KU-Z-Nf0-3SdAB58LghrYcSWKBboXF71_ryIn3rNImSetFBUma7VnTOiPifvBEaUYG5jEOnLE2ZRP0TvgHVlLiJPd23VzpXpTEfRtyyTF_Al3zLx2wRo_VQ1onlmAPJsgWhuYyeWir8NYyLhfJ3etpMEDmd4mjvBrOzloP0mNsep89gnc3eWcLcQb0NX45SVwtvPcT8qqRwHsqjvC8ElJsyLRVulZ5t_ox41moeXsFQLYVwCJg1OSGBziffYZ2q7r1U4gRZPjZzoSeFV6xgIPxn3o0PS-R2OOme5zXngmhMGeBEZyH_7CfyPxqwpYZse8G3ov5Q)। সেসময় জাতীয় সংগীত গেয়েছিলেন রাজা মিয়ার কিশোরী কন্যা রুবি ম্যাডাম ও তাঁর দল। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষনার ৩ দিন আগে ভেড়ামারার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে দেশপ্রেমের প্রমান দিয়েছিলেন।

আর যিনি দুঃসাহসিক সেই কাজটি হাসিমুখে সুসম্পন্ন করেছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে- প্রিয় ভেড়ামারার মাটিতে। “স্যালুট-শ্রদ্ধেয় রুহুল স্যার, স্যালুট-হেড স্যারদের হেড স্যার”। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যিনি হানাদার বাহিনীর হাতে একাধিকবার ধরা পড়ে ছাড়া পেয়েছিলেন, যিনি স্কুলের বিজ্ঞানাগার থেকে রাসায়নিক দ্রবাদি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করতেন বোমা বানানোর জন্য, স্বাধীনতার পর বীর মুক্তিযোদ্ধারা যার হাত থেকে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট গ্রহন করেছিলেন, নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবী করার যথেষ্ট সুযোগ থাকার পরও যিনি সুযোগ গ্রহন করেননি, তিনি জীবন্ত কিংবদন্তী রুহুল ইসলাম।

আর মাত্র ১ দিন পর মহান স্বাধীনতা দিবস। স্থানীয় প্রশাসন নানা আয়োজনের মধ্যে উদযাপন করবে দিবসটি। গতানুগতিকভাবে সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে রুহুল স্যারকে হয়তো আমন্ত্রণ জানানো হবে সেসব অনুষ্ঠানে। কিন্ত একটু উদ্যোগ নিলেই বেঁচে থাকা মানুষটিকে আলাদাভাবে সম্মান জানানো সম্ভবত, সম্ভব। আমার জানা মতে, ভেড়ামারার বর্তমান ইউএনও সাহেব ([Sohel Maruf](https://www.facebook.com/sohel.maruf.1?__tn__=K-R&eid=ARB2mgkj9H7oMowq4391jDUd3OzVZEADs9jToRHni8PpinGH3le6_i1FERYBeTVYqca1wh5fTlTk8bm8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdZOpIFJkZk06Uos3KU-Z-Nf0-3SdAB58LghrYcSWKBboXF71_ryIn3rNImSetFBUma7VnTOiPifvBEaUYG5jEOnLE2ZRP0TvgHVlLiJPd23VzpXpTEfRtyyTF_Al3zLx2wRo_VQ1onlmAPJsgWhuYyeWir8NYyLhfJ3etpMEDmd4mjvBrOzloP0mNsep89gnc3eWcLcQb0NX45SVwtvPcT8qqRwHsqjvC8ElJsyLRVulZ5t_ox41moeXsFQLYVwCJg1OSGBziffYZ2q7r1U4gRZPjZzoSeFV6xgIPxn3o0PS-R2OOme5zXngmhMGeBEZyH_7CfyPxqwpYZse8G3ov5Q), [UNO Office Bheramara](https://www.facebook.com/uno.officebheramara/?__tn__=K-R&eid=ARCIbHH2FBZPFk5--jU0OIRvA8oF03u18Zps2GQPajN4Y8LeinbUWg8NSAKpwVwpf1oKKTsq5dc-C6aN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdZOpIFJkZk06Uos3KU-Z-Nf0-3SdAB58LghrYcSWKBboXF71_ryIn3rNImSetFBUma7VnTOiPifvBEaUYG5jEOnLE2ZRP0TvgHVlLiJPd23VzpXpTEfRtyyTF_Al3zLx2wRo_VQ1onlmAPJsgWhuYyeWir8NYyLhfJ3etpMEDmd4mjvBrOzloP0mNsep89gnc3eWcLcQb0NX45SVwtvPcT8qqRwHsqjvC8ElJsyLRVulZ5t_ox41moeXsFQLYVwCJg1OSGBziffYZ2q7r1U4gRZPjZzoSeFV6xgIPxn3o0PS-R2OOme5zXngmhMGeBEZyH_7CfyPxqwpYZse8G3ov5Q)) শুধু একজন দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তাই নন, তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সৈনিক। তাঁর সামান্য প্রচেষ্টায় হতে পারে আরো ভালো কিছু। দুর থেকে সে কাংঙ্খিত সময়ের অপেক্ষায় থাকলাম।

## কুষ্টিয়ার দৌলতপুর-মিরপুর ও ভেড়ামারা মুক্ত দিবস

৮ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার মিরপুর, ভেড়ামারা দৌলতপুর উপজেলা হানাদার মুক্ত দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর এই দিনে হানাদার মুক্ত হয় এই তিন উপজেলা। ১৯৭১ সালের এই দিনে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানা শক্রমুক্ত করে থানা চত্বরে বিজয় পতাকা উড়ান মুক্তিকামী বীর সূর্য সন্তানেরা। দৌলতপুরকে হানাদারমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের সম্মুখ যুদ্ধসহ ছোট-বড় ১৬টি যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এসব যুদ্ধে ৩৫জন বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ কয়েকশ নারী-পুরুষ শহীদ হন।

৮ ডিসেম্বর সকালে উপজেলার আল্লারদরগা এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে শহীদ হন বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি সেনারা। এরপর দৌলতপুরকে হানাদার মুক্ত ঘোষণা করেন তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর নুরুন্নবী। একই দিন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলাও হানাদারমুক্ত হয়েছিল। ৮ ডিসেম্বর ভোরে ই-৯ এর গ্রুপ কমান্ডার আফতাব উদ্দিন খান ১৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মিরপুর থানায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গান স্যালুটের মাধ্যমে উত্তোলন করেন। এরপর ৬৫জন পাকিস্তানি সেনা, তাদের দোসর ও রাজাকার পাহাড়পুর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আত্মসমর্পন করে। মিরপুর হানাদার মুক্ত হওয়ার সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ১৯৭১ সালের এই দিনে বিভিন্ন বয়সের হাজারও নারী-পুরুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে।

আজকের এই দিনে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাও হানাদারমুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মিত্র বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধা কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাকে শত্রু মুক্ত করে। এই দিন ৮নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর আবুল মুনছুরের নেতৃত্বে জেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদুল আলমের নেতৃত্বে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভোর ৭টার সময় ভেড়ামারা ফারাকপুরে পাকহানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রায় ৭ ঘণ্টা ব্যাপী এই যুদ্ধে আট পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। যুদ্ধের পর পরই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রায় ৫০/৬০ জন বিহারী নিহত হয়। এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে ভেড়ামারায় অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদের মনোভল ভেঙে যায়। তারা সন্ধ্যার আগেই ভেড়ামারা থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে পালিয়ে যায়। এই দিন রাতে মুক্তিপাগল মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে ভেড়ামারায় প্রবেশ করতে থাকেন। তারা বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন।

# কুষ্টিয়ার তিন উপজেলা হানাদারমুক্ত হয় একই দিনে

জানা যায়, ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিরপুর উপজেলা সভাপতি আফতাব উদ্দিন খানের নেতৃত্বে শতাধিক মুক্তিকামী ছাত্রজনতা বর্তমান মাহমুদা চৌধুরী কলেজ রোডের পোস্ট অফিস সংলগ্ন মসজিদে শপথ গ্রহণ করেন।

৩০ মার্চ শেষ রাতে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর জিলা স্কুলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু হলে হানাদার বাহিনী নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে যশোর সেনানিবাসের সাহায্য চায়। কিন্তু সেখান থেকে সাহায্যের কোনো সংকেত না পেয়ে হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে তিনটি গাড়িতে করে গুলিবর্ষণ করতে করতে যশোর সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়।পথে ঝিনাইদহ জেলার গাড়াগঞ্জের কাছে রাস্তা কেটে তৈরি করা মুক্তিবাহিনীর ফাঁদে পড়ে যায় পাক সৈন্যদের দু’টি গাড়ি। এসময় ওই এলাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয় তারা। হানাদার বাহিনীর ছয় সদস্য ভোরে জিলা স্কুল থেকে মিরপুরের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। এসময় তারা মশান বাজার সংলগ্ন মাঠের মধ্যে তীব্র প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে। সেসময় গুলি চালালে মশানের ডা. আব্দুর রশিদ হিলম্যান, গোলাপ শেখ, আশরাফ আলী ও সোনাউল্লাহ শহীদ হন। মিরপুর থানার কামারপাড়ায় বিছিন্নভাবে তিন হানাদারের সঙ্গে স্থানীয় মুক্তিকামীদের আবারও যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মিরপুর থানার সিপাহী মহিউদ্দিন শহীদ হন।

অপর পক্ষে হানাদার বাহিনীর ওই তিন সদস্যও নিহত হয়। শহীদ সিপাহী মহিউদ্দিনের কবরের পাশে মিরপুর উপজেলার শহীদ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর ভোরে ই-৯ এর গ্রুপ কমান্ডার আফতাব উদ্দিন খান ১৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মিরপুর থানায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গান স্যালুটের মাধ্যমে উত্তোলন করেন। এর পর ৬৫ জন হানাদার বাহিনীর দোসর ও রাজাকার পাহাড়পুর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করে। মিরপুর হানাদারমুক্ত হওয়ার সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ১৯৭১ সালের এই দিনে বিভিন্ন বয়সের হাজারো নারী-পুরুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ উল্লাস করতে থাকে।

**দৌলতপুর মুক্ত দিবস**

দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের এই দিনে (৮ ডিসেম্বর) দৌলতপুরকে শত্রুমুক্ত করে থানা চত্বরে বিজয় পতাকা উড়ানো হয়।

দৌলতপুরকে হানাদারমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হানাদারদের ছোট-বড় ১৬টি সম্মুখ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এসব যুদ্ধে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ কয়েকশ’ নারী-পুরুষ শহীদ হন। সবচেয়ে বড় যুদ্ধ সংঘঠিত হয় উপজেলার ধর্মদহ ব্যাংগাড়ী মাঠে। এ যুদ্ধে প্রায় সাড়ে তিনশ’ হানাদার নিহত হয়। শহীদ হন তিন জন মুক্তিযোদ্ধা ও তিন জন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্য।

৮ ডিসেম্বর সকালে আল্লারদর্গায় হানাদাররা দৌলতপুর ত্যাগ করার সময় তাদের গুলিতে মুক্তিযোদ্ধা রফিক শহীদ হয়। এরপর দৌলতপুর হানাদার মুক্ত ঘোষণা করেন তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মেজর নুরুন্নবী।

**ভেড়ামারা মুক্ত দিবস**

১৯৭১ সালের এই দিনে মিত্র বাহিনীর সহায়তায় হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ভেড়ামারাকে শত্রুমুক্ত করা হয়। এই দিন ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর আবুল মুনছুরের নেতৃত্বে জেলা কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা রাশেদুল আলমের নেতৃত্বে ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে ভোর ৭টার সময় ভেড়ামারা ফারাকপুরে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রায় ৭ ঘণ্টা এই যুদ্ধে ৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। যুদ্ধের পর পরই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রায় ৫০/৬০ জন বিহারী নিহত হয়। এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে ভেড়ামারায় অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা সন্ধ্যার আগেই ভেড়ামারা থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে পালিয়ে যায়। এই দিন রাতে মুক্তিপাগল মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে ভেড়ামারায় প্রবেশ করতে থাকে। তখন তারা বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠে।

বাংলাদেশ সময়: ০৯৩৩ ঘণ্টা, ডিসেম্বর ০৮, ২০১৮

ভেড়ামারা উচ্চ বিদ্যালয় ইতিহাস

## প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

অত্র এলাকার জ্ঞানী বিদ্যুৎসাহী ব্যাক্তিদের উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলার জেলা ম্যাজিষ্টেটের সহায়তায় বাবু জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ,নরপতি বিশ্বাস,মাখন লাল জমিদার,গৌরগোপাল বিশ্বাস জমিদার,প্রসন্ন কুমার সরকার, নন্দগোপাল গোস্বামী, প্রথম বাঙালী জজ জগদুর্লভ মজুমদার, ভেড়ামারা ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফতেহ্ আলী পন্ডিত প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী নিয়ে সর্বপ্রথম এই বিদ্যালয়টি ০১/০১/১৯১৮ খ্রীঃ এ জুনিয়র স্কুল হিসেবে এ্যাফিলিয়েশন পেয়ে এম ই স্কুল হিসেবে চন্ডিপুর নন্দনা নদীর তীরে স্থাপিত হয়। তৎকালীন নদীয়া জেলার জেলা ম্যাজিষ্টেটের নাম অনুসারে স্কুলটির নাম রাখা হয় ভেড়ামারা চন্ডিপুর যোগেন্দ্র কুমার ইনষ্টিটিউশন সংক্ষেপে বি সি জে কে ইনষ্টিটিউশন। তৎকালীন প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী।

এঅবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯১২ সালে পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ স্থাপিত হলে ভেড়ামারা এলাকার গুরুত্ব আগের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায় এবং সেইসাথে পদ্মা নদীর ভাঙা গড়ার খেলায় ভেড়ামারার অবস্থান দৃঢ় হলে ভেড়ামারা ও চন্দিপুরবাসী সকলে মিলেমিশে বি সি জে কে ইনষ্টিটিউশন কে ভেড়মারায় স্থানান্তর করেন। তৎকালীন জানকী ভূষন সাহার দানকৃত জমির উপর ষ্টেশন মাষ্টার নুরুজ্জামান চৌধূরীর আর্থিক সহায়তায় লাল ভবনে শুরু হয় ভেড়ামারা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম তারপর ০১/০২/১৯২১ খ্রীঃ এ মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে এ্যাফিলিয়েশন পায়। কালের গতিধারা অনুসারে স্কুলটি চলছিল অন্যান্ন স্কুলের ন্যায়। ১৯৪৭ সালে অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষক ভারতে চলে গেলে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক শুন্যতা সৃষ্টি হয়।

সে সময়ে ঘন ঘন প্রধান শিক্ষক পরিবর্তন ও বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়টির সূনাম হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়।বিদ্যালয়টির এমন দুঃসময়ে আগমন ঘটে মোহাঃ রুহুল ইসলাম এম এ বি এড ১৯৬২ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একটানা ৩৮ বছর অত্যন্ত দক্ষ ও শক্ত হাতে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৯ সালে একটি সুন্দর সাজানো গোছানো মনোরম পরিবেশের প্রতিষ্ঠান রেখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।এরমধ্যে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন আমলে ভেড়ামরা উচ্চ বিদ্যালয় ফলাফল সহ সার্বিক খ্যাতির জন্যই পাইলট প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের নাম হয় “ভেড়ামারা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়” । অদ্যবধি প্রধান শিক্ষক হিসেবে ২৪ জন প্রধান শিক্ষকবৃন্দের নাম ও কার্যকাল লিপিবদ্ধ আছে।

**ভেড়ামারা মুক্ত দিবস ১২ই ডিসেম্বর**

১৯৭১ সালের ১২ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ সাঁড়াশি আক্রমনের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীসহ তাদের এ দেশীয় দোসররা পিছু হটে। ১১ ডিসেম্বর রাতে পাকহানাদাররা পরাস্ত হয়ে ভেড়ামারা-পাকশি হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর মাইনস চার্জ (বোমা) নিক্ষেপ করে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ১২ নং স্প্যানটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে পদ্মা নদী পার হয়ে পালিয়ে গেলে ১২ই ডিসেম্বর এ শহরটি শত্রু মুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ৮ নং সেক্টরের অধীনে ছিলো কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা।

এখানে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকহানাদার বাহিনীর মধ্যে অন্তত ১৫টি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এরা হলেন- মোকারিমপুর ইউনিয়নের গোলাপনগর গ্রামের রফিকুল ইসলাম (বীর প্রতীক), চাঁদ আলী, লুৎফর রহমান, দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রমের গিয়াস উদ্দীন, সাতবাড়ীয়া গ্রামের সোহরাব হোসেন, চাঁদগ্রামের উজির আলী, এবং সাতবাড়ীয়া গ্রামের নজরুল ইসলাম। এছাড়াও এসব যুদ্ধে পাকহানাদারদের নির্মমতার শিকার হয়ে অন্তত শতাধিক মুক্তিকামী মানুষ শহীদ হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পর ভেড়ামারার যুব সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন ফ্রিডম ফাইটার নামে ৫টি, অ্যাকশন কমিটি নামে ১টি এবং পলিটিক্যাল নামে ১টি কমিটি গঠন করা হয়।

ফ্রিডম ফাইটার কমিটির নেতৃত্ব দেন কমান্ডার মহিউদ্দীন বানাত, কমান্ডার আব্দুর রহমান, কমান্ডার মোকাদ্দেস হোসেন, কমান্ডার তোবারক হোসেন। পলিটিক্যাল কমিটির নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম এবং ভেড়ামারা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অ্যাড. আলম জাকারিয়া টিপু। স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৭৩ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একযোগে চতুর্দিক থেকে একের পর এক পাক ঘাঁটি আক্রমন করে ধ্বংস করে রাজাকার আলবদরদের আস্তানা।

সর্বশেষ ১১ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর দুর্বার প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে পাকহানাদার বাহিনী পালিয়ে যায়। পাকহানাদাররা এ সময় মাইনস চার্জ (বোমা) নিক্ষেপ করে হাডিঞ্জ ব্রিজের ১২নং স্প্যানটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১২ই ডিসেম্বর ভেড়ামারা শত্রু মুক্ত হয়।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি  
দেখেছি আমাদের গ্রামের কত বাড়ীঘর আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে,  
গৃহহারা শরণার্থী হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছি ওপারে।   
দেখেছি আষাঢ় শ্রাবণ মাস তুমুল বৃষ্টি আর হাটুসমান কাদা,  
হেটে চলেছে দল বেধে সবে, যেতে পারিনি কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

হেটে চলেছি মাইলের পর মাইল, কতই না করেছি কষ্ট,

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি

চন্ডিপুরের ট্যাজিটি,দেখেছি তর তাজা ১৪টি প্রাণ

পাক বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে শহীদ করেছে

যাদের ছিল না কোন অন্যায়, নিরহ মানুষ,

ইতিহাস আজ তার স্বাক্ষি, চন্ডিপুর বর্ধভূমি

আমাদের হাত ছানি দিয়ে ডাকছে,

আহত যুদ্ধা আমির খসরু

হয়েছে এতিম, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি  
দেখেছি মটার সেল গ্রেনেড রাইফেল আরো কত আগ্নে অস্ত্র,  
যুদ্ধের বিমান, ট্রাঙ্ক, কামান, পাক হানাদার বাহিনী সশস্ত্র।   
মুক্তিবাহিনীর মাথায় টোকা, কৃষানের কাজ করছে অস্ত্র সেরে,  
হায়েনা পাঞ্জাবী সারিসারি গ্রামে ঢুকতেই দিচ্ছে ধ্বংস করে।  
আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি...   
দেখেছি অন্ধকার রাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আলোক উজ্জল আকাশ,  
ঠুশ –ঠাশ ডেডা-ডেডা শব্দ, আর বারুদের গন্ধে ভরা বাতাস।  
দেখেছি বাংলার মুক্তিকামি মানুষের মনে ছিল কতো স্বপ্নআঁকা,  
ত্রিশলক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা।

### জাতির পিতা

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনবৃত্তান্ত**

**১৭ই মার্চ, ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ লুৎফুর রহমান এবং সায়রা বেগমের ঘরে জন্ম নেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন। ১৮ বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের ২ মেয়ে - শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং তিন ছেলে- শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল।**

**অল্পবয়স থেকেই তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। কট্টরপন্থী এই সংগঠন ছেড়ে ১৯৪৩ সালে যোগ দেন উদারপন্থী ও প্রগতিশীল সংগঠন বেঙ্গল মুসলিম লীগে। এখানেই সান্নিধ্যে আসেন হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে রক্ষণশীল কট্টরপন্থী নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কর্তৃত্ব খর্ব করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ।**

**ভাষা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিব। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদ এবং ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয় যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে।**

**পঞ্চাশের দশক তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের কাল। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন দূরদর্শীতা এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক কুশলী রাজনৈতিক নেতা। এসময় শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানীর সাথে মিলে গঠন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। তিনি দলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী হন মুজিব। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি।**

**১৯৬৩ সালে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ মুজিব। তিনি ছিলেন আইয়ুব খানের ‌মৌলিক গণতন্ত্র তত্ত্বের কট্টর সমালোচক। ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের রূপরেখা।**  
**মুজিবের ৬ দফার প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ভীত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার শেখ মুজিবকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাংলার সমস্ত জনগণ। জনরোষের কাছে নতি স্বীকার করে এক পর্যায়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় শোষকগোষ্ঠী। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়৷সেখানেই উত্থাপিত হয় এগার দফা দাবি যার মধ্যে ছয় দফার সবগুলোই দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। লাখো মানুষের এই জমায়েতে শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়৷**

**১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’। তিনি বলেন, “একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র ‘বঙ্গোপসাগর’ ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে ‘বাংলা’ কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ”।**

**১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির পুরোপুরি বিপক্ষে ছিলো। আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদের অধিবেশন ডাকা নিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। শেখ মুজিব তখনই বুঝে যান যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই।**

**১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। ঐতিহাসিক এ ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃংখল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, “রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। ... প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে”।**  
**বঙ্গবন্ধুর ডাকে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা বাংলা। মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালি জাতির এই জাগরণে ভীত ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, নিষিদ্ধ করেন আওয়ামী লীগকে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন।**

**এরপর আসে ২৫ মার্চ, ১৯৭১। রাতের অন্ধকারে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা; শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড।অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে কোলের শিশু- কেউ রক্ষা পায়না পাক হায়েনাদের নারকীয়তা থেকে। মুজিবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অবশ্য তার আগেই, পাক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান।**

**১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এ সরকারের অধীনেই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী এবং শুরু হয় পাক সেনাদের প্রতিহত করার পালা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর, ৩০ লক্ষ বাঙ্গালীর প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে আসে বিজয়। ১৬ ডিসেম্বর সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান যেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেখানেই বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের নতুন একটি দেশ।**

**১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনককে বরণ করতে লাখো মানুষের ঢল নামে বিমানবন্দরে। দেশে ফিরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু । মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানান বঙ্গবন্ধু এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাহায্য আসতে শুরু করে। শুরু হয় বাংলাদেশ পুনর্গঠনের এক নতুন যুদ্ধ। এরই মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে রাজনৈতিক অস্থিতশীলতা সৃষ্টি করতে উঠেপড়ে লাগে এই চক্রটি। এসময় বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৭৪ সালে তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার নীচে আনতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা ‘বাকশাল'। একই সাথে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রথম যে দলটি নিষিদ্ধ করা হয় তার নাম বাংলাদেষ আওয়াশী লীগ, শেখ মুজিবের নিজের দল।এর ফলে দেশে স্থিতিশীলতা আসতে শুরু করে। সমস্ত দেশ যখন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, ঠিখ তখনই আসে আরেকটি আঘাত।**

**১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা হত্যা করে শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময় দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান। সদ্য স্বাধীন জাতির জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে আসে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড, তৈরি করে রাজনৈতিক শূণ্যতা, ব্যাহত হয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারা।**

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ কে জানি

আগামী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে জানার জন্য মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক কর্মসূচী চলছে সারা বাংলাদেশের স্কুলে ৭ম শ্রেণি শিক্ষার্থীদের নিয়ে।।

কেন বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে…

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আমরা তার কর্মময় জীবনের দিকে তাকালে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাই, যা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তার দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি তার সহমর্মিতা, তিনি একটি স্থির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে, সেই পথে যাত্রা শুরু করে তা থেকে বিচ্যুত হননি।

দৃঢ়চিত্ততা, সংকল্প ও কর্মোদ্যম। তিনি যে অবস্থানেই কর্মরত ছিলেন- ছাত্রনেতা, স্থানীয় পর্যায়ের নেতা বা জাতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রনেতা- প্রতিটি বিষয়কে তিনি গভীর অভিনিবেশ দিয়ে ভাবতেন, তার সংকল্প নির্ধারণ করতেন এবং স্থির চিত্তে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন।

তার জীবনের প্রতিকূলতাগুলোকে সহজভাবে নেয়া, যে কারণে দীর্ঘ কারাবাসেও তিনি বিচলিত হননি; যে কোনো বিপর্যয়ে তিনি চিত্তের স্থিরতা হারাননি এবং চরম দুর্বিপাকেও তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি।   
এ প্রজন্মের তরুণদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন সেটি হচ্ছে- স্থানীয় চিন্তার সঙ্গে বৈশ্বিক চিন্তার একটি মিলন ঘটানো।  
এই স্থিতিস্থাপকতাটি নেতৃত্বের এক বিশাল গুণ। এটি সব পর্যায়ে সব ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে মানবিক শিক্ষাকেও মেলানোর কথা বলেছেন।

তিনি প্রযুক্তির সক্ষমতার সঙ্গে আমাদের স্থানীয় জ্ঞানকে ধারণ করতে বলেছেন। এটিও আমি মনে করি এ প্রজন্মের তরুণদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

যে কারণে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় তা তার অসাম্প্রদায়িক এবং প্রবলভাবে মানবিক চিন্তা-চেতনার জন্য। বিভেদ-বিভাজনের এ যুগে যখন রাজনৈতিক মতপাথর্ক্য মানুষকে সৌজন্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়- বঙ্গবন্ধুর স্বাভাবিক সৌজন্য, মানবিকতা এবং মানুষের প্রতি, এমনকি প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান দেখানোর চর্চাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গবন্ধু আমাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছেন, জাতি হিসেবে যার চর্চা করা আমাদের প্রয়োজন। তিনি আমাদের অতীতকে সামনে এনে বর্তমানকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতের দিকে আমরা যেতে পারি সে রকম একটি ভূমি আমাদের দিয়েছেন। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা যেন অব্যাহত রাখি- সেটিই বোধহয় বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা দেখানোর একটি ভালো উপায়। তিনি শতবর্ষী কিন্তু তিনি চিরন্তন।

বাংলাদেশে যত ক্রান্তিকাল আসবে, বঙ্গবন্ধুকে আমাদের বিশেষ করে প্রয়োজন পড়বে। তার কাছ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা নেব, যাতে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি।

তাই সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসাবে সারা বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক কর্মসূচী চলছে, ভিডিও মাধ্যমে সাক্ষাৎকার ধারণ চলছে,, এই নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে সারা বাংলাদেশের ন্যায় তা‌হের মাধ্য‌মিক বিদ্যালয় ইত মধ্যে ডকুমেন্ট তৈরী করেছে ।

**ভেড়ামারার ইতিহাস**

বাংলাদেশে উপজেলা সদরের মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি ভেড়ামারার। কুষ্টিয়া জেলা সদর হতে ২৩ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ভেড়ামারা উপজেলা সদর। ১৫৩.৭২ বর্গকিলোমিটার ভূখন্ডের ভেড়ামারা উপজেলায় বসবাস করে ১লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৮০ জন মানুষ। এর মধ্যে পুরুষ রয়েছে ৯০ হাজার ৭০০ এবং মহিলা রয়েছে ৮৪ হাজার ৭৮০ জন।

এ উপজেলার উত্তর পূর্বে পদ্মানদীর উপর দুই সমান্তরাল যুগল সৌন্দর্য ‘হার্ডিঞ্জব্রীজ’ ও ‘লালনশাহ’ সেতু। পূর্ব দক্ষিণে জেলার মিরপুর ও পশ্চিমে দৌলতপুর উপজেলা এবং পূর্বে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা। ১টি পৌরসভা ও ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদ। এখানে রয়েছে ৮১টি গ্রাম এবং ৪৩টি মৌজা। ভেড়ামারা পূর্বে থানা হিসেবে পরিচিতি থাকলেও ১৯৮১ সালের ৭ নভেম্বর ভেড়ামারা উপজেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কুষ্টিয়ার পরেই দেশের এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভেড়ামারার সুনাম। দেশের বৃহত্তম গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, ৬০ মেগওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিশ্বের ১১তম বৃহৎ এবং দেশের বৃহৎ রেলওয়ে সেতু ‘হার্ডিঞ্জ ব্রীজ’ এবং নৈসর্গিক সমান্তরাল সেতু দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক সেতু ‘লালনশাহ’।

রয়েছে হযরত সোলাইমান শাহ্ চিশতির মাজার শরীফ এবং গায়েবী মসজিদ খ্যাত তিন গম্বুজ মসজিদ। ভেড়ামারা উপজেলার নামকরণের কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস জানা যায় না। তবে লোক মুখে এবং শহুরীগ্রামাঞ্চলে নানা কথার প্রচলন রয়েছে। জানা যায়, ভেড়ামারা এলাকায় অতীতে প্রচুর ভেড়া পালন করা হতো। তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে ট্রেন চলাকালীন অবস্থায় ভেড়ামারা ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একযোগে শতাধিক ভেড়া ট্রেনের নীচে পড়ে কাটা পড়ে মারা যায়। সেই সময় ‘ভেড়া’ হতেই ভেড়ামারার নামকরণ করা হয়েছিল ভেড়ার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য।

### দর্শনীয় স্থান :

ভেড়ামারার দর্শনীয় এবং মনেমুগ্ধকর স্থান রয়েছে। পদ্মা নদী দেশের একমাত্র যুগল সৌন্দর্যের দুই সমান্তরাল ব্রীজটি এই নদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে যা ভেড়ামারায় অবস্থিত। ‘হার্ডিঞ্জ ব্রীজ’ এবং ‘লালনশাহ সেতু’র চারদিকে সবুজের সমারোহ। পূর্ব দিকে পদ্মা নদী। দুই সেতুর মাঝখানের পশ্চিম পাড় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা এলাকা। একদিক থেকে অন্যদিকে তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছে প্রমত্ত্বা পদ্মার পানি। কংক্রীটের ব্লক দিয়ে বাঁধাই করা দীর্ঘ বাঁধের উপর দাঁড়ালেই এই পানির স্রোতের শব্দ শোনা যায়। এলাকাটির পরিবেশ অত্যন- চমৎকার এবং মনোমুগ্ধকর। এর উপর ‘লালনশাহ্’ সেতু সৃষ্টি করেছে এক নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য্। এছাড়াও রয়েছে দেশের বৃহত্তম গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি। ভেড়ামারা উপজেলার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ৩টি মাজার এবং গায়েবী মসজিদ খ্যাত তিন গম্বুজ মসজিদ রয়েছে। এখানে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত আশেকানদের আগমন ঘটে।

**ঘোড়েশাহ্ মাজার:**  
মাজারটি উপজেলা সদর হতে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ধরমপুর ইউনিয়নে অবসি'ত। প্রতিবছর ওয়াজ মাহাফিলে প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগম ঘটে থাকে এখানে।

**সোলেমান শাহ মাজার:**  
পদ্মা নদীর তীরে উপজেলা সদর হতে ৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে মোকারিমপুর ইউনিয়নে সোলেমান শাহ্র মাজার অবসি'ত। প্রতিবছর ওয়াজ মাহাফিলে দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থান হতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত আশেকান হাজির হয়।

**ধরমপুর মাজার:**  
ছোট ছোট ইটদিয়ে ব্রিটিশ আমলে তৈরী ধরমপুর মাজার। মাজারে কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শনও পাওয়া যায়।

**তিন গম্বুজ মসজিদ:**  
এটা অবস্থিত ধরমপুর ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া নামক স'ানে। শোনা যায়, কোন এক সময় একই রাতে পৃথিবীতে সাতটি গায়েবী মসজিদ তৈরী হয়, যা ফেরেস্তারা তৈরী করে বলে কথিত আছে। সে সময় তিন গম্বুজওয়ালা ঐ মসজিদটি সাতবাড়িয়া এলাকায় অসমাপ্তভাবে শেষ হয়। এটা অনেকের কাছে গায়েবী মসজিদ নামে পরিচিত।

**হার্ডিঞ্জ ব্রীজ:**  
বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ এবং দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে সেতু ‘হার্ডিঞ্জ ব্রীজ’র নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৫ সালের ৪ই মার্চ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন তৎকালীন ভাইস রয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। তারই নামানুসারে পাকশী ব্রীজটির নামকরণ হয় হার্ডিঞ্জ ব্রীজ।

বিদেশী পর্যটক তথা অবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, নাগক্ষান- ও উত্তর পূর্ব অংশের সঙ্গে কলকাতা দিল্লীর সহজ যেগাযোগের কথা বিবেচনা করে অবিভক্ত ভারত সরকার ১৮৮৯ সালে পদ্মা নদীর উপর দিয়ে সেতু তৈরীর প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯০৯ সালে পদ্মার ওপর দিয়ে ব্রীজ নির্মাণের জরিপ কাজ শুরু হয়। ১৯১২ সালে ভয়াল পদ্মার দুই তীর ব্রীজ রক্ষাকারী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় দেখা দিলে গাইড ব্যাংক নির্মাণ করা হয় উজান থেকে ৪/৫ মাইল পর্যন্ত। ব্রীজ নির্মাণের মূল কাজ শুরু হয় ১৯১২ সালে। সে সময় খরস্রোতা উন্মুক্ত পদ্মার স্রোতকে পরাজিত করে ১২টি কূপ খনন করা হয়।

৫হাজার ৮৯৪ ফুট দৈর্ঘ্যের এই ব্রীজটি ১৫টি স্প্যানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি স্প্যানের ওজন ১ হাজার ২৫০ টন। ব্রীজটিতে ১৫টি স্প্যান দু’পাড়ে ৭৫ ফিট করে অতিরিক্ত ল্যান্ড স্প্যান রয়েছে। ২৪ হাজার ৪০০ জন শ্রমিকের দীর্ঘ ৫ বছর অক্লান- পরিশ্রমের পর ১৯১৫ সালে ব্রীজের কাজ শেষ হয়। ব্রীজটি নির্মাণ করতে তৎকালীন সময়ের সর্বাপেক্ষা ব্যয় হয় ৩ কোটি ৫১ লাখ ৩২ হাজার ১শ ৬৪ টাকা। এর মধ্যে স্প্যানের জন্য ১ কোটি ৮০ লাখ ৫৪ হাজার ৭শ’ ৯৬ টাকা, ল্যান্ড স্প্যান স্থাপনের জন্য ৫ লাখ ১৯ হাজার ৮শ’ ৪৯ টাকা, নদীর গতি নিয়ন্ত্রনের জন্য ৯৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩শ’ ৪৬ টাকা, দু’পাড়ের রেল লাইনের জন্য ৭১ লাখ ৫৫ হাজার ১শ’ ৭৩ টাকা।

**লালন শাহ সেতু:**   
লালন শাহ সেতু বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক সেতু। প্রমত্তা পদ্মা নদীর উপর নির্মিত ১৭৮৬ মিটার দৈর্ঘ্যের এবং ৭.৫ মিটার দুই লেন বিশিষ্ট সেতুটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। সেতুটিতে মোট ১৭টি স্প্যান রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি স্প্যান ১০৯.৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং সেতুর উভয় প্রান্তের-র স্প্যান ২টির প্রতিটি দৈর্ঘ্য ৭১.৭৫ মিটার। ডিভাইডারসহ মূল সেতু ১৮.০৩ মিটার প্রশস-। ডিভাইডারের উভয় পার্শ্বে পরস্পর বিপরীতমুখী যানবাহন চলাচলের জন্য ৭.৫ মিটার প্রশস- ২ লেন ক্যারেজওয়ে এবং রেলিংসহ ১.০০ মিটার ফুটপথও তৈরী হয়েছে। ৩ মিটার ডায়ামিটার ও দীর্ঘ ৯১.০০ মিটার এবং অধিক ৬৪ টি সংখ্যার পাইল নির্মাণ এই সেতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সেতুর ডেক পৃথিবীর অবিচ্ছন্ন দীর্ঘতম ডেক। সেতুর উভয় প্রানে- ডুয়েল ২ লেন। এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সংযোগ ১০ কিঃমিঃ ও পশ্চিম প্রান্তে- ৬ কিঃমিঃ এর মাধ্যমে এন ৭৪ জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১০৬৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস-বায়নের জন্য জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন প্রায় ৮২০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। অবশিষ্ট অর্থ ২৪৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের। ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে এবং এর ফিজি বিলিটি স্টাডি, ডিজাইন ও নির্মাণ শেষে ১৮ মে ২০০৪ সালে সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

**গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প:**   
দেশের বৃহত্তম গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পটি ভেড়ামারায় অবসি'ত। এ প্রকল্পের আওতাধীন দক্ষিণাঞ্চলের চারটি জেলার ১লাখ ৯৭ হাজার ৫শ’ হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পায়। এর ফলে প্রতি বছর আবাদী জমিতে লক্ষ্য মাত্রার খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতাধীন রয়েছে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার লাখ লাখ কৃষকের আবাদী জমি। এই প্রকল্পে ৩টি মেইন পাম্প সহ ১২টি সাবসিডিয়ারী পাম্প রয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের করুন দশা। পানির অভাব এবং বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজের কারণে প্রায়শঃই জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে এই প্রকল্প। এই পাম্প চালাতে পানির প্রয়োজন নূন্যতম ১২ দশমিক ৬ মিটার। মূলত পানির অভাবে পাম্প গুলো অচল হয়ে পড়েছে। বিগত ১৯৫৪ সালে জি কে সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে প্রকল্পের প্রথম এবং ৮৩ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ করতে ব্যয় হয় ৭৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের কাজের মধ্যে সাগরখালী খালে একটি ক্রস বাধ নির্মাণ অন্যতম। প্রথম পর্যায়ের কাজ চলা কালে বাধটি নির্মাণ করে প্রকল্পে গঙ্গা সেচ খাল তৈরী করা হয়।

**৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র:**  
ভেড়ামারায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ৩টি ইউনিটে জাতীয় পর্যায়ের বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসনে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে থাকে। গ্যাস টারবাইন এ ৩টি ইউনিট থেকে ৫৫ থেকে ৫৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় প্রতিদিন। যা বিদ্যুতের বর্তমান সংকটময় পরিসি'তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহণ করে থাকে। তেল দ্বারা চালিত এ ইউনিটগুলোর জন্য প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হাজার লিটার ডিজেল তেল ব্যয় হয়। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ব্যয় হয় ১ ওয়াগন ডিজেল।

দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল ছাড়াও উত্তর অঞ্চলে বিদ্যুতের লোড শেডিং ও লো ভোল্টেজ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমিকা অত্যন- গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৬ সালে ভেড়ামারার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১ ও ২নং ইউনিট দু’টি উৎপাদন শুরু করে এবং ৩নং ইউনিটটি উৎপাদনে আসে ১৯৮০ সালে । গ্যাস টারবাইন এ ইউনিট গুলোর কার্যক্রম ক্ষমতা বেঁধে দেওয়া হয়েছে সর্ব্বোচ্চ ২০ বছর। অথচ ১ও ২ নং ইউনিট টি চলছে ২৯ বছর এবং ৩ নং ইউনিট টি চলছে ২৫ বছর ধরে। এ কেন্দ্রটি বর্তমানে রুগ্নদশা চলছে।

**৭১এর মুক্তিযুদ্ধ:**   
মুক্তিযুদ্ধের সময় ভেড়ামারার বীর সন-ানরা বলিষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। সে সময়ের ইতিহাস ভেড়ামারার মানুষের জন গৌরবের ইতিহাস বলে বিবেচিত। কুষ্টিয়া জেলা তথা ৮ নং সেক্টরের সর্বশেষ যুদ্ধ হয় ভেড়ামারায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী এলাকার হাজার হাজার নারী পুরুষ, শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে পদ্মা নদীর পাড়ে লাশগুলো ফেলে দেয়। রাজাকাররা সাধারণ মানুষকে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। পাকবাহিনী বেশ কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন গোরস'ান, ফসলের ক্ষেত, ডোবানালায় মানুষের মাথার খুলি হাড় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সে সময়ের অনেক স্মৃতি বিজড়িত স'ান ভেড়ামারা। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে প্রতিরোধ করতে মিত্রবাহিনীর ছোঁড়া বোমায় হার্ডিঞ্জব্রীজের একটি গার্ডার ক্ষতিগ্রস' হয়। ব্রীজটি ক্ষতিগ্রস' করার উদ্দেশ্যই ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার ধ্বস। এই যুদ্ধে ভেড়ামারায় প্রায় ২ শতাধিক বীর বাঙালী সশস্ত্র সংগ্রাম করে। এর মধ্যে সম্মুখ সময়ে লড়াই করে ৮জন মুক্তিকামী বাঙালী শহীদ হয়েছিলেন। এরা হলেন, শহীদ জসিম উদ্দীন, শহীদ রফিক, চাঁদ আলী, নজরুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দীন, লুৎফর রহমান, শাহাজান আলী, ফজলুল হক।

**ঐতিহ্যবাহী পান:**  
অতি প্রাচীনকালে থেকেই ভেড়ামারায় পানের চাষ হয়। দিন যত গড়িয়েছে পানের চাষ ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভেড়ামারায় পান দক্ষিণ পশ্চিমের ১০টি জেলার চাহিদা মিটিয়েও উত্তরবঙ্গসহ দেশের প্রায় ৪০টি জেলায় পানের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। শুধু তাই নয় ভেড়ামারার পান সুদূর পাকিস্তানে রপ্তানী হয়ে থাকে। পান থেকে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করে থাকে।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' - কার্যক্রম

৭ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ১০জন করে ৬টি দলে ভাগ করে ভেড়ামারা উপজেলার যুদ্ধকালিন উল্লেখ্য যোগ্য স্থান সমুহ পরিদর্শন করে । তার মধ্যে চন্ডিপুর বর্ধ ভুমি, হাডিং ব্রীজ বর্ধভুমি, ফারাকপুর যুদ্ধ স্থান, হাডিং ব্রীজ যুদ্ধ স্থান, পরিদর্শন । ভেড়ামারা উপজেলার উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার জনাব আলহাজ্ব মো: আলম জাকারিয়া টিপু, যুদ্ধহত মো: আমির খসরু, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং মুক্তি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছেন তাদের নিকট বিভিন্ন প্রশেন্র মাধ্যমে সাক্ষাতকার গ্রহন । ভিডিও ডকমেন্ট তৈরী । জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং তার জীবনী সম্পর্কে মুল্যবান তথ্য জানা এবং লিপিব্ধ করন। চন্ডিপুর বর্ধ ভুমিতে একই পরিবারের ১৪জন শহীদ , ৪জন আহত এবং হাডিং ব্রীজ ৫জন শহীদের তথ্য পাওয়া যায় । যুদ্ধ কালিন সময় উল্লেখ যোগ্য ঘটনা প্রবাহ ডকুমেন্ট তৈরী করা হয়।

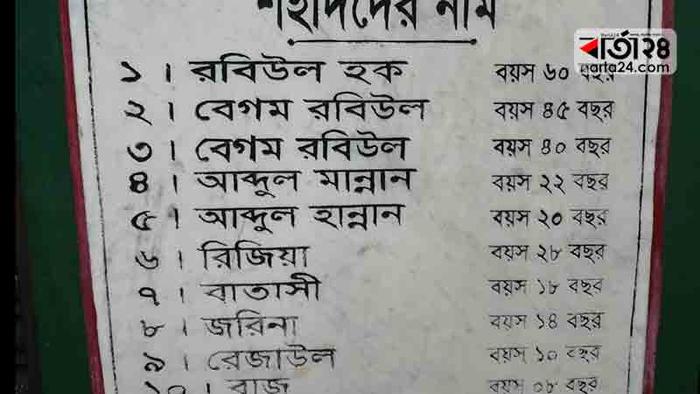
**মুক্তিযুদ্ধে ১৬ জন নিহত, শহীদের মর্যাদা চান কোহিনুর ভিলার সদস্যরা**

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছিল কুষ্টিয়া শহরের দেশওয়ালীপাড়ার কোহিনুর ভিলার সদস্যরা। আর এ কারণে ওই পরিবারের ১৬ সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা।



সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত একটি সাইনবোর্ডে নিহত ১৬ জনের নাম লেখা রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল দীর্ঘদিনের পুরোনো ওই বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা। একতলা বাড়িটির ছাদে টিন, রেলের পাত ও শালকাঠের পিলার দেয়া। সেসবসহ পলেস্তারা খসে পড়ছে। তবে বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হলেও জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে বসবাস করছে পরিবারের সদস্যরা।

এছাড়াও কোহিনুর ভিলার পেছনে ১৬ জনের গণকবরটিও রয়েছে অযত্ন আর অবহেলায়। বছরের আজকের দিনটিতে কেবল পরিবারের পক্ষ থেকে মিলাদ মাহফিল করা হয়ে থাকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কিংবা প্রশাসনের আয়োজনে কোনো অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না।

 ছবি: বার্তাটোয়েন্টিফোর.কম

কোহিনুর ভিলার সদস্য আব্দুল হালিম বার্তাটোয়েন্টিফোর.কমকে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কোহিনুর ভিলার ১৬ সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করার কারণে তাদের হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের গণকবর দেয়। হত্যার শিকার ওই ১৬ সদস্যের মধ্যে কোহিনুর ভিলার গৃহকর্তাসহ তার স্ত্রী-সন্তান, কর্মচারী, আত্মীয় ছিল।

তিনি বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত ওই সাইনবোর্ডটি দেখে মানুষ মনে করে আমরা সরকারিভাবে অনেক সহযোগিতা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের কোনো সহযোগিতা করা হয় না। আমাদের থাকার ঘরের পরিবেশ নেই এবং সেই গণকবরটিও অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে।’

তিনি সরকারের কাছে দাবি করে বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার নিহতদের যেন শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়। আমরা পরিবারের সদস্যরা সেই অপেক্ষাতে আছি।’

কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু বলেন, ‘এই কোহিনুর ভিলা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই বাড়িসহ গণকবরটি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি আমরা স্মৃতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব। ওই পরিবারের একজনকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। আর ওই নিহত ১৬ জনকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’

### মুক্তিযোদ্ধা

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ভোটার নং** | **গেজেট/বিশেষ গেজেট/**  **মুক্তিবার্তা নম্বর** | **ভোটারের নাম** | **পিতার নাম** | **গ্রাম/মহলস্না** | **ইউনিয়ন/**  **পৌরসভা** | **মমত্মব্য** |
| 1. | ৭৭৮ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | মৃত জিন্নাত উলস্নাহ প্রামানিক | কলেজপাড়া | পৌরসভা ২ নং ওয়ার্ড |  |
| 2. | ৭৭৯ | মোঃ আবু তাহের | মৃত আলতাব উদ্দীন | নওদাপাড়া | ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 3. | ৭৮০ | মোঃ আব্দুল হান্নান | মৃত আব্দুল মান্নান | ফারাকপুর | পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 4. | ৭৮১ | মোঃ আনছার আলী | মৃত এছর উদ্দিন প্রামানিক | নওদাপাড়া | পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 5. | ৭৮৫ | মোঃ নবীর উদ্দীন | মৃত রবেদ আলী শেখ | আড়কান্দি | বাহাদুরপুর |  |
| 6. | ৭৮৬ | মোঃ নুরম্নল আলম | মজির উদ্দিন প্রাং | কাজিপাড়া | বাহাদুরপুর |  |
| 7. | ৭৮৭ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম ফুন্না | মৃত আকবর আলী বি: | পূর্ব নওদাপাড়া | চাঁদগ্রাম/১ নং ওয়ার্ড |  |
| 8. | ৭৮৮ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | মৃত মসলেম উদ্দীন | স্বরম্নপের ঘোপ | ধরমপুর |  |
| 9. | ৭৮৯ | মোঃ মহিউদ্দীন বানাত | মৃত মজির উদ্দীন | সাতবাড়িয়া | ধরমপুর |  |
| 10. | ৭৯০ | মোঃ শামসের আলী | মৃত রজব আলী সর্দ্দার | ফকিরাবাদ | মোকারিমপুর |  |
| 11. | ৭৯১ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | মৃত শের আলী | চরদামুকদিয়া | বাহিরচর/১নং ওয়ার্ড |  |
| 12. | ৭৯২ | মোঃ সেকেন্দার আলী | বাদল প্রামানিক | বাহিরচর বারদাগ | বাহিরচর ২ নং ওয়ার্ড |  |
| 13. | ৭৯৪ | মোঃ মসলেম উদ্দীন | ইছার কবিরাজ | হরিপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 14. | ৭৯৬ | মোঃ আবু দাউদ | মৃত মজের আলী প্রামানিক | নওদাপাড়া | পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 15. | ৭৯৭ | তমিজ উদ্দীন আহম্মেদ | মৃত রাহাজ উদ্দীন প্রামানিক | নওদাপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 16. | ৭৯৯ | মোঃ জহুরম্নল আলম বিজলী | মৃত সামছুজ্জোহা | কলেজপাড়া | ৩ নং ওয়ার্ড |  |
| 17. | ৮০০ | সুজা উদ্দীন | মৃত আজিজুল হক | মধ্যবাজার | ৩ নং ওয়ার্ড |  |
| 18. | ৮০১ | আলম জাকারিয়া | মৃত আজিজুল হক | মধ্যবাজার | ৩ নং ওয়ার্ড |  |
| 19. | ৮০২ | মহিদুল ইসলাম | মৃত আজিজুল হক | মধ্যবাজার | ৩ নং ওয়ার্ড |  |
| 20. | ৮০৩ | আব্দুল হান্নান | মৃত আব্দুল মান্নান | কলেজপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 21. | ৮০৫ | জাকির হোসেন | মৃত মেছের আলী প্রামানিক | নওদাপাড়া | ১নং ওয়ার্ড |  |
| 22. | ৮০৬ | মোঃ শামসুল আলম বিশ্বাস | মৃত রহমান উলস্নাহ বিশ্বাস | ফারাকপুর | পৌরসভা ১নং ওয়াড |  |
| 23. | ৮০৭ | তোবারক হোসেন | মৃত বাবর আলী প্রামানিক | আড়কান্দি | বাহাদুরপুর |  |
| 24. | ৮১১ | মহিউদ্দীন | কফের উদ্দীন মালিথা | রায়টা | বাহাদুরপুর |  |
| 25. | ৮১৪ | মোঃ নুরম্নজ্জামান বাদশা | মৃত লুৎফর | নওদাপাড়া | চাঁদগ্রাম |  |
| 26. | ৮১৫ | মোঃ জয়েনউদ্দীন বিশ্বাস | মৃত আনছার আলী | নওদাপাড়া | চাঁদগ্রাম |  |
| 27. | ৮১৬ | মোঃ মহিউদ্দিন | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল | পূর্ব নওদাপড়া | চাঁদগ্রাম ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 28. | ৮১৭ | মোঃ মুক্তার হোসেন | মৃত ছামেদ আলী মোলস্না | চন্ডিপুর | চাঁদগ্রাম |  |
| 29. | ৮১৮ | মোঃ ইউনুছ আলী | মৃত ইয়াদ আলী | নওদাপাড়া | চাঁদগ্রাম ১ নং ওয়ার্ড |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ভোটার নং** | **গেজেট/বিশেষ গেজেট/**  **মুক্তিবার্তা নম্বর** | **ভোটারের নাম** | **পিতার নাম** | **গ্রাম/মহলস্না** | **ইউনিয়ন/**  **পৌরসভা** | **মমত্মব্য** |
| 30. | ৮২০ | মোঃ মওলা বক্স | মৃত কেরামত আলী | চাঁাদগ্রাম | চাঁাদগ্রাম |  |
| 31. | ৮২২ | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত ইবাদত আলী মন্ডল | চন্ডিপুর | চাঁদগ্রাম |  |
| 32. | ৮২৪ | মোঃ আনার আলী | মৃত মছের সর্দার | কাজিহাটা | ধরমপুর |  |
| 33. | ৮২৫ | মোঃ মহসিন আলী | মৃত মেছের সর্দার | কাজিহাটা | ধরমপুর |  |
| 34. | ৮২৬ | মোঃ গোলাম সরোয়ার | মৃত নুরম্নল হক বিশ্বাস | নবগঁঙ্গা | ধরমপুর |  |
| 35. | ৮২৭ | অধ্যাপক আমিরম্নল ইসলাম | মৃত ডা: আব্দুর রহিম বিশ্বাস | সাতবাড়িয়া | ধরমপুর |  |
| 36. | ৮২৯ | আফতাব উদ্দীন | মৃত আমানত আলী | রামচন্দ্রপুর | ধরমপুর ২ নং ওয়ার্ড |  |
| 37. | ৮৩৩ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত কেরামত আলী মন্ডল | গোলপনগর | মোকারিমপুর |  |
| 38. | ৮৩৪ | আক্তার হোসেন | মৃত খলিল উদ্দীন সর্দার | গোলাপনগর | মোকারিমপুর |  |
| 39. | ৮৩৫ | মহঃ আমজাদ হোসেন | মৃত আব্দুল জলিল | গোপিনাথপুর | মোকারিমপুর ওয়ার্ড ৩ |  |
| 40. | ৮৩৬ | জামাল উদ্দিন | মৃত বনি আমিন শেখ | ÿÿমিরদিয়াড় | মোকারিমপুর |  |
| 41. | ৮৩৯ | আবুল কাশেম | আফতাব আলী | মসলেমপুর | বাহিরচর ১৬ দাগ |  |
| 42. | ৮৪০ | আশরাফূল আলম বাচ্চু | আব্দুল মতলেব | ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 43. | ৮৪১ | গোলজার হোসেন | মেহের আলী | ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 44. | ৮৪২ | রেজাউল করিম | চাঁদ আলী | ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 45. | ৮৪৩ | ফজলুর রহমান | আজিমুদ্দীন | ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 46. | ৮৪৪ | আবু বক্কর সিদ্দিক | মোজাফফর আলী | ১২ দাগ | বাহিরচর |  |
| 47. | ৮৪৫ | ছানা উলস্নাহ | হজ্জত আলী মন্ডল | চরদামুকদিয়া | বাহিরচর |  |
| 48. | ৮৪৬ | মোয়াজ্জেম | আ: সোবান | ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 49. | ৮৪৭ | হযরত আলী গাজী | কফিল উদ্দীন গাজী | মওলাহাবাসপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 50. | ৮৪৮ | মিনার হোসেন | মৃত দবিরম্নদ্দীন | দলুয়া | জুনিয়াদহ |  |
| 51. | ৮৫০ | তোফাজ্জল হোসেন | মফেজুদ্দীন | দলুয়া | জুনিয়াদহ |  |
| 52. | ৮৫১ | হাফিজুর রহমান | মোজাহার প্রামানিক | ফয়জুলস্নাপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 53. | ৮৫২ | আ: সামাদ | মুনতাজ মন্ডল | মির্জাপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 54. | ৮৫৩ | মোসত্মফা কামাল | আ: রহমান | দোলুয়া | জুনিয়াদহ |  |
| 55. | ৮৫৪ | মোঃ রাশেদ আজগর | মৃত আ: জববার প্রা: | নওদাপাড়া | পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 56. | ৮৫৫ | শহিদুল ইসলাম | সৈয়দ সামছুল ইসলাম | কুঠিবাজার | পৌরসভা |  |
| 57. | ৮৫৬ | শাজাহান আলী | মৃত বরম্নন সর্দার | কলেজপাড়া | পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 58. | ৮৫৭ | ফজলুর রহিম | মৃত চাঁদ আলী | ফারাকপুর | ভেড়ামারা |  |
| 59. | ৮৫৮ | নুরম্নল ইসলাম | মৃত খোরশেদ আলী | মঠপাড়া | ভেড়ামারা পৌরসভা |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ভোটার নং** | **গেজেট/বিশেষ গেজেট/**  **মুক্তিবার্তা নম্বর** | **ভোটারের নাম** | **পিতার নাম** | **গ্রাম/মহলস্না** | **ইউনিয়ন/**  **পৌরসভা** | **মমত্মব্য** |
| 60. | ৮৫৯ | গোলাম সারোয়র | মৃত জহির উদ্দীন | কলেজপাড়া | পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড |  |
| 61. | ৮৬১ | খাইরম্নল ইসলাম লাল্টু | মৃত খোরশেদ আলী | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর৩নং ওয়ার্ড |  |
| 62. | ৮৬২ | মোঃ সাজদার রহমান | মৃত আছের উদ্দীন প্রাং | রায়টা | বাহাদুরপুর |  |
| 63. | ৮৬৪ | মোঃ আব্দুল হালিম | মৃত হামিদ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 64. | ৮৬৫ | নূর মহম্মদ (কামাল) | মৃত নইম উদ্দীন মন্ডল | বাহাদুরপুর | বাহাদুপুর |  |
| 65. | ৮৬৬ | মোঃ পিয়ার আলী | মৃত নবীর উদ্দীন শেখ | বামনপাড়া | চাঁদগ্রাম ৩নং ওয়ার্ড |  |
| 66. | ৮৬৭ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত আব্দুল আলী | নওদাপাড়া | চাঁাদগ্রাম |  |
| 67. | ৮৭১ | লাল মোহাম্মদ | মৃত মকছেদ আলী | পূর্ব নওদাপাড়া | চাঁদগ্রাম |  |
| 68. | ৮৭২ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | মৃত রিয়াজ উদ্দীন | চন্ডিপুর | চাঁদগ্রাম ২ নং ওয়ার্ড |  |
| 69. | ৮৭৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম কুববাত | মৃত কুতুব উদ্দিন | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা |  |
| 70. | ৮৭৬ | মোঃ নবীরউদ্দীন | মৃত আফাজদ্দিন | বিত্তিপাড়া | ধরমপুর |  |
| 71. | ৮৮০ | মোঃ নুর আলম তাশফের | মৃত আনোয়ার আলী মালিথা | ÿÿমিড়দিয়াড় | মোকারিমপুর |  |
| 72. | ৮৮১ | মোঃ ফজলুর রহমান | মৃত আবুল হোসেন | ÿÿমিড়দিয়াড় | মোকারিমপুর |  |
| 73. | ৮৮২ | মোঃ মশিউর রহমান | মৃত আনোয়ার আলী মালিথা | ÿÿমিড়দিয়াড় | মোকারিমপুর |  |
| 74. | ৮৮৩ | মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন | মৃত আজিম উদ্দিন | মহারাজপুর | মোকারিমপুর |  |
| 75. | ৮৮৪ | মোঃ আফছার আলী | মৃত মুরাদ আলী খলিফা | ফকিরাবাদ | মোকারিমপুর |  |
| 76. | ৮৮৫ | মোঃ শফিকুল আক্তার | মৃত ডাঃ নইমউদ্দিন আহমেদ | ÿÿমিড়দিয়াড় | মোকারিমপুর |  |
| 77. | ৮৮৬ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | মৃত কাদের মোলস্না | চরদামুকদিয়া | বাহিরচর |  |
| 78. | ৮৮৭ | মোঃ একরামুল হক তাজু | মৃত ফজলুল হক | ষোল দাগ | বাহিরচর |  |
| 79. | ৮৮৮ | মোঃ আজিজুল হক | মৃত খোরশেদ আলী প্রামানিক | ষোল দাগ | বাহিরচর ১৬ দাগ |  |
| 80. | ৮৮৯ | মোঃ হেদায়েতুলস্না কাজল | মোঃ ফজলুল হক | ষোলদাগ | বাহিরচর |  |
| 81. | ৮৯১ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত পরেশ উলস্নাহ | ষোলদাগ | বাহিরচর |  |
| 82. | ৮৯২ | হারম্নন-অর-রশিদ | মৃত আহমদ আলী | ষোলদাগ | বাহিরচর |  |
| 83. | ৮৯৩ | আতিয়ার রহমান | মৃত আঃ সোবহান | পঃ বাহিরচর | বাহিরচর |  |
| 84. | ৮৯৪ | মোঃ আব্দুল মজিদ | মৃত সামাদ আলী | পঃ বাহিরচর | বাহিরচর |  |
| 85. | ৮৯৬ | মোঃ মুনির উদ্দিন | মৃত মছের উদ্দিন মন্ডল | মির্জাপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 86. | ৮৯৭ | মোঃ মাহবুবুর রহমান | মৃত মফি উদ্দিন সেখ | পূর্বভেড়ামারা | চাঁদগ্রাম/১নং ওয়ার্ড |  |
| 87. | ৮৯৮ | আব্দুস সামাদ | মৃত ফরিদ সেখ | নবগঙ্গা | ধরমপুর |  |
| 88. | ৮৯৯ | শ্রী গনেশ চন্দ্র কুন্ডু | মৃত গনেন্দ্র নাথ কুন্ডু | কাচারীপাড়া | পৌরসভা |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ভোটার নং** | **গেজেট/বিশেষ গেজেট/**  **মুক্তিবার্তা নম্বর** | **ভোটারের নাম** | **পিতার নাম** | **গ্রাম/মহলস্না** | **ইউনিয়ন/**  **পৌরসভা** | **মমত্মব্য** |
| 89. | ৯০০ | অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম | মৃত ইয়াছিন আলী মালিথা | রথপাড়া | ভেড়ামারা পৌরসভা |  |
| 90. | ৯০২ | আ.ফ.ম. নজিবুদৌলা খান | মৃত ফজলে রাবিব খান | কলেজপাড়া | ২নং ওয়ার্ড ভেড়ামারা |  |
| 91. | ৯০৩ | মোঃ আতাউর রহমান | মৃত ইমাদ আলী খান | কুঠিবাজার | ভেড়ামারা |  |
| 92. | ৯০৪ | এ এইচ এম নুরম্নজ্জামান | মৃত আলহাজ হাসান উদ্দিন আহমেদ | নওদাপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 93. | ৯০৫ | মোঃ শহিদুল আলম | মৃত সিরাজুল হক | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা ২নং ওয়ার্ড |  |
| 94. | ৯০৭ | মোঃ আব্দুল হালিম চৌধুরী | মৃত মুনসুর আহম্মদ চৌধুরী | দঃ রেলগেট | ২নং ওয়ার্ড পুরাতন |  |
| 95. | ৯১০ | আব্দুলস্নাহ আল সিদ্দিক | মৃত ইছাহক আলী | ভেড়ামারা | ৩ নং ওয়ার্ড |  |
| 96. | ৯১১ | ডাঃ আব্দুলস্নাহ আল ফারম্নক | মৃত ইছাহক আলী | ভেড়ামারা | ৩ নং ওয়ার্ড |  |
| 97. | ৯১২ | মোঃ ইসরাইল হোসেন | মৃত রেজওয়ান আলী | ফারাকপুর | ভেড়ামারা |  |
| 98. | ৯১৩ | মোঃ আব্দুস সামাদ | মৃত মফিজ উদ্দিন | কাচারীপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 99. | ৯১৯ | এ এইচ এম নূর উদ্দিন | মৃত আলহাজ হাসান উদ্দিন আহমেদ | নওদাপাড়া | চাঁদগ্রাম |  |
| 100. | ৯২০ | মোঃ বিশারত আলী | মৃত ভিকু মন্ডল | মির্জাপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 101. | ৯২১ | মোঃ জয়েনুদ্দিন | মৃত হোসেন গাইন | দলুয়া | জুনিয়াদহ |  |
| 102. | ৯২২ | মোঃ আব্দুল হাকিম | মৃত অব্দুল হামিদ | জুনিয়াদহ | জুনিয়াদহ |  |
| 103. | ৯২৪ | মোঃ আজমল হক খান | মৃত আহাদ আলী খান | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 104. | ৯২৬ | মোঃ হায়দার আলী | মৃত আফিল উদ্দীন | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 105. | ৯২৭ | মোঃ রশিদুল আলম | মৃত আলহাজ ম: আফসার আলী | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 106. | ৯২৮ | মোঃ মনিরম্নজ্জামান | মৃত রফিজ উদ্দীন | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 107. | ৯২৯ | শামসুল আলম | মৃত ছাদেক আলী | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 108. | ৯৩০ | মোঃ মুজিবুল হক | মৃত ফয়েজ সরদার | গোলাপনগর | মোকারিমপুর |  |
| 109. | ৯৩১ | মোঃ ইউনুছ আলী | মৃত মুমত্মাজ আলী সরকার | ÿÿমিরদিয়ার | মোকারিমপুর |  |
| 110. | ৯৩২ | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত অনাত মন্ডল | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 111. | ৯৩৩ | মোঃ সেকেন্দার আলী | মৃত আরশেদ আলী | বাহাদুরপুর | ২নং ওয়ার্ড |  |
| 112. | ৯৩৪ | ডঃ এম আলাউদ্দিন | মোঃ মওলা বক্স | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 113. | ৯৩৮ | শ্রী রতন কুমার সরকার | মৃত শিবু | সাতবাড়িয়া | ধরমপুর |  |
| 114. | ২৭০৭ | ডাঃ পিয়ার উদ্দিন | মৃত মহাসিন আলী | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা |  |
| 115. | ২৭০৮ | মোঃ আবুল হাশেম | মৃত হাজী সৈয়দ আলী | বামনপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 116. | ২৭০৯ | মোঃ আজগর আলী | মৃত আছের আলী সরদার | বামনপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 117. | ২৭১৩ | মোঃ আসাদুল হক | মৃত আঃ আজিজ | নওদাপাড়া | মোকারিমপুর |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ভোটার নং** | **গেজেট/বিশেষ গেজেট/**  **মুক্তিবার্তা নম্বর** | **ভোটারের নাম** | **পিতার নাম** | **গ্রাম/মহলস্না** | **ইউনিয়ন/**  **পৌরসভা** | **মমত্মব্য** |
| 118. | ২৭১৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত আ: আজিজ | নওদাপাড়া | মোকারিমপুর |  |
| 119. | ২৭১৬ | মোঃ আখতারউজ্জামান | মৃত রম্নসত্মম আলী | মসলেমপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 120. | ২৭১৭ | মীর হোসেন ইউনুস টিপু | মৃত মীর ইউনুস আলী | মসলেমপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 121. | ২৭১৯ | গোলাম জোহা | মৃত এ এস এম রোমান | বাহিরচর ১৬দাগ | বাহিরচর |  |
| 122. | ২৭২১ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত কেরামত আলী | ফারাকপুর | ভেড়ামারা |  |
| 123. | ২৭২২ | ডাঃ মোঃ মনসুর রহমান | মৃত মফের আলী সরদার | কুচিয়ামোড়া | বাহাদুরপুর |  |
| 124. | ২৩১৫ | হেদায়েতুল ইসলাম(হাবিলদার) | খন্দকার মতিউল হাসান | জুনিয়াদহ | জুনিয়াদহ |  |
| 125. | ২৫৪৬ | আব্দুল লতিফ(সুবে: মেজর) | মোজাহার আলী মোলস্না | বামনপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 126. | ১০৮৩৬ | মোঃ বজলুর রহমান(হাবিলদার) | ফাজিল উদ্দীন | মওলাহাবাসপুর | জুনিয়াদহ |  |
| 127. | ১০৮৪৭ | মোঃ আব্দুল কাদের | আব্দুল হামিদ | কোলদিয়াড় |  |  |
| 128. | ১০৮৭৪ | মোঃ হারম্নন অর রশিদ(ল্যা:নায়েক) | লুৎফর রহমান | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 129. | ১০৮৮২ | মোঃ ইয়াছিন আলী | মোঃ আজম উদ্দীন | কাচারীপাড়া | পৌরসভা |  |
| 130. | ১৫০২০ | মোঃ নোওয়াবুল ইসলাম(সুবেদার) | মরহুম আজিজুল ইসলাম | পরানখালী | জুনিয়াদহ |  |
| 131. | ১৭১০ | আবু বক্কর সিদ্দিক(ল্যা: নায়েক) | বচরত মন্ডল | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা |  |
| 132. | ১১৪২ | মোঃ ফসি উলস্নাহ খান (হাবিলদার) | ওয়াহেদ আলী খান | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা |  |
| 133. | ১৯৩৫ | ইমদাদুল হক (হাবিলদার) | ওহেদ আলী খান | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা |  |
| 134. | ৪৭৪৩ | এসকেন্দার আলী(নায়েক) | মোঃ আফিল উদ্দীন দফাদার | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 135. | ২১৬ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আজিম উদ্দীন | জুনিয়াদহ | জুনিয়াদহ |  |
| 136. | ০৪১১০৩০১১৪ | মোঃ রবিউল আওয়াল মিন্টু | মশারফ হোসেন | স্বরম্নপদহ | গোড়াদহ |  |
| 137. | ০৪১১০৩০০৪৭ | মোঃ নওশেদ আলী | মৃত আ; রহিম বক্স | জুনিয়াদহ | জুনিয়াদহ |  |
| 138. | ০৪১১০৩০১৪২ | মোঃ নুরম্নল আলম | মৃত লইম উদ্দীন | কাজীপাড়া | বাহাদুরপুর |  |
| 139. | ০৪১১০৩০১৬২ | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | মৃত আববাস আলী বিশ্বাস | ভেড়ামারা কুঠিবাজার | ভেড়ামারা |  |
| 140. | ০৪১১০৩০১৬৪ | মোঃ মনজুর রহমান | মৃত আজিজুল হক | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা |  |
| 141. | ০৪১১০৩০১৬৫ | মোঃ ছয়েদ আলী | মৃত আঃ গফুর | ÿÿমিরদিয়াড় | মোকারিমপুর |  |
| 142. | ০৪১১০৩০১৬৯ | মোঃ আবুল মনছুর | মৃত মোজাহারম্নল হক লাল মিয়া | কুঠিবাজার | ধরমপুর |  |
| 143. | ০৪১১০৩০১৭২ | মোঃ আখতার হোসেন | মৃত হামিজ উদ্দীন | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |  |
| 144. | ০৪১১০৩০১৭৪ | মোঃ হাসানুল হক ইনু | মৃত কামরম্নল হক টুনু মিয়া | গোলাপনগর | মোকারিমপুর |  |
| 145. | ০৪১১০৩০১৭৮ | মোঃ রফেজ মন্ডল | মৃত রমজান মন্ডল | কাজিহাটা | ধরমপুর |  |
| 146. | ০৪১১০৩০১৭৯ | মোঃ আকরাম হোসেন | মৃত আজিম উদ্দীন মন্ডল | চন্ডিপুর | ভেড়ামারা |  |
| 147. | ০৪১১০৩০১৮১ | মোঃ মনজুর আলম মন্টু | মৃত নবীর উদ্দিন মন্ডল | বাহাদুপুর | বাহাদুরপুর |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ভোটার নং** | **গেজেট/বিশেষ গেজেট/**  **মুক্তিবার্তা নম্বর** | **ভোটারের নাম** | **পিতার নাম** | **গ্রাম/মহলস্না** | **ইউনিয়ন/**  **পৌরসভা** | **মমত্মব্য** |
| 148. | ০৪১১০৩০১৮৫ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত আব্দুল গফুর | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 149. | ০৪১১০৩০১৯০ | এম এ আজিজা খানম | মৃত আফছার আলী | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 150. | ০৪১১০৩০১৯১ | মোঃ আনজুম ফেরদৌস | মৃত আলহাজ আজিুজুল হক | বাহিরচর ১৬ দাগ | বাহিরচর |  |
| 151. | ২৮ | আব্দুল মজিদ(অব:) | মরহুম আজাহার আলী | নওদাপাড়া | ভেড়ামারা |  |
| 152. | ২৯৬৯ | মোঃ আমান উলস্নাহ | বিশ্বাস | মসলেমপুর | বাহাদুরপুরু |  |
| 153. | ৩০৩৩ | ইনামুল হক | আখতারম্নল হক | গোলাপনগর | মোকারিমপুর |  |
| 154. | ২৯৮০ | মোঃ আব্দুল মজিদ | মালিথা | ষোলদাগ | বাহিরচর |  |
| 155. | ২৯৬৩ | মোঃ এলাহী বক্স | খান | ষোলদাগ | বাহিরচর |  |

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এর নির্দেশনায় সারা দেশের ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মুল্যায়নের অংশ হিসেবে  
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। জাতীয় পর্যায়ে এই প্রথম এত বড় পরিসরে স্কুলের শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাচ্ছে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার সহ মুক্তিযোদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের কাছাকাছি যাবার, তাদের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার। এই কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল অনলাইন প্লাটফর্ম কিশোর বাতায়ন। ( [www.konnect.edu.bd](http://www.konnect.edu.bd/?fbclid=IwAR3K8ybxo0xeUcingmP8CHwMvSUGpxDg2K3Y5n2_wdH85GSIMkGNK03DTlo) )

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত চলবে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্ব। এরপর স্কুলে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সেরা তিনটি ভিডিও একসাথে এডিট করে প্রতি স্কুল থেকে ১টি ২০ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টারি পাঠাবে উপজেলা বাছাই কমিটির নিকট। উপজেলা পর্যায়ে যাচাই বাছাই এর পর সেরা ৩টি স্কুলের ভিডিও পাঠানো হবে জেলায়, তারপর বিভাগে ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বিজয়ী শিক্ষার্থীদের তৈরি ভিডিও সমূহ তুলে দেয়া হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে, বিজয়ী দেওয়া হবে বিশেষ পুরষ্কার ও সম্মাননা।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে এই কার্যক্রমের প্রচুর তথ্য আমরা পাচ্ছি। শিক্ষকগণ তাদের ফেসবুক আইডি থেকেও তাদের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত শেয়ার করছেন যা মাউশি'র ডিজি মহোদয় স্বয়ং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন।

[#যেহেতু](https://www.facebook.com/hashtag/যেহেতু?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDtf9KTZD5XxXJvCBizSTXz8jyr96x-V4fS2MBq_4efx3MoMTvazCYNMUBSwAvWijiyvWSuNlcgMUobaabx23ErB13iMM8pvKu1MqR3F3qix-ZWwWCuye4m-dk3gXKn2EySLT4Qd7dGufdP_2BBhUFB0sGythGxL0kaoOVgk2_5n8EFtGmDN-INxTRpnCP2Bdh0XPG7f4eVKLS6wqZ-mbX5O6Xxh7NPihVYSlQ6XFXNn6V-eZkZq4r9w3lQMu7dar5MRQrO1xTeYcUgWJu41I8rLIWHTPKXUuOugyvJSFXVs4zfCPZYWTc0ZFV99OhcNTuY4ejz&__tn__=%2ANK-R) ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকারগ্রহণ সহ প্রতিবেদন ও ভিডিও তৈরি করবে, তাই শিক্ষার্থী ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের কাছে আহবান থাকবে আপনারা [#কিশোর\_বাতায়নের](https://www.facebook.com/hashtag/কিশোর_বাতায়নের?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDtf9KTZD5XxXJvCBizSTXz8jyr96x-V4fS2MBq_4efx3MoMTvazCYNMUBSwAvWijiyvWSuNlcgMUobaabx23ErB13iMM8pvKu1MqR3F3qix-ZWwWCuye4m-dk3gXKn2EySLT4Qd7dGufdP_2BBhUFB0sGythGxL0kaoOVgk2_5n8EFtGmDN-INxTRpnCP2Bdh0XPG7f4eVKLS6wqZ-mbX5O6Xxh7NPihVYSlQ6XFXNn6V-eZkZq4r9w3lQMu7dar5MRQrO1xTeYcUgWJu41I8rLIWHTPKXUuOugyvJSFXVs4zfCPZYWTc0ZFV99OhcNTuY4ejz&__tn__=%2ANK-R) [#খবরদার](https://www.facebook.com/hashtag/খবরদার?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDtf9KTZD5XxXJvCBizSTXz8jyr96x-V4fS2MBq_4efx3MoMTvazCYNMUBSwAvWijiyvWSuNlcgMUobaabx23ErB13iMM8pvKu1MqR3F3qix-ZWwWCuye4m-dk3gXKn2EySLT4Qd7dGufdP_2BBhUFB0sGythGxL0kaoOVgk2_5n8EFtGmDN-INxTRpnCP2Bdh0XPG7f4eVKLS6wqZ-mbX5O6Xxh7NPihVYSlQ6XFXNn6V-eZkZq4r9w3lQMu7dar5MRQrO1xTeYcUgWJu41I8rLIWHTPKXUuOugyvJSFXVs4zfCPZYWTc0ZFV99OhcNTuY4ejz&__tn__=%2ANK-R) এর [#মুক্তিযুদ্ধ](https://www.facebook.com/hashtag/মুক্তিযুদ্ধ?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDtf9KTZD5XxXJvCBizSTXz8jyr96x-V4fS2MBq_4efx3MoMTvazCYNMUBSwAvWijiyvWSuNlcgMUobaabx23ErB13iMM8pvKu1MqR3F3qix-ZWwWCuye4m-dk3gXKn2EySLT4Qd7dGufdP_2BBhUFB0sGythGxL0kaoOVgk2_5n8EFtGmDN-INxTRpnCP2Bdh0XPG7f4eVKLS6wqZ-mbX5O6Xxh7NPihVYSlQ6XFXNn6V-eZkZq4r9w3lQMu7dar5MRQrO1xTeYcUgWJu41I8rLIWHTPKXUuOugyvJSFXVs4zfCPZYWTc0ZFV99OhcNTuY4ejz&__tn__=%2ANK-R) মেন্যুতে আপনাদের কার্যক্রমের ছবিসহ, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পরিচয়, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দলের সকলের দায়িত্ব সবিস্তারে লিখে পোস্ট করেন। এতে আপনাদের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের সকলের ইতিবাচক ধারনা তৈরি হবে।

#### গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প

ভেড়ামারা উপজেলায় অবস্থিত গঙ্গা কপতাক্ষ সেচ প্রকল্প। ভেড়ামারা উপজেলার উত্তরপাশে অবস্থিত।

দেশের বৃহত্তম গঙ্গা-কপোতাক্ষ জি কে সেচ প্রকল্প প্রয়োজনীয় সংস্কার হলে ৪ জেলার ১৩ উপজেলার হাজার হাজার কৃষক চাষাবাদে সুফল পেত। ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটত এতদঞ্চলের কৃষক পরিবারের।  
  
কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার কৃষির গুণগত মান বৃদ্ধি, স্বল্প ব্যয় এবং অধিক উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পদ্মা নদীর তীরে গঙ্গা কপোতাক্ষ (জি কে) নামের দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। ১৯৬৯ সালে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। সে সময় প্রকল্পের আওতায় ৪ জেলার ১৩ উপজেলার ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের আওতাধীন সব জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হলেও পরে পদ্মা নদীতে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় পাম্পের প্রধান ইনটেক চ্যানেলের মুখে পলি ও বালুচর জমে ওঠে। পানি না থাকায় একে একে ভরাট হয়ে যায় জি কে প্রজেক্টের খালগুলো। পানির অভাবে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটেক চ্যানেল ছাড়াও পদ্মার উজান মুখে ড্রেজিং করে সেচ প্রকল্পটি চালু রাখা হয়। সে কারণে প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে প্রকল্পটির আওতাধীন জমির পরিমাণ। প্রকল্পটির জমির পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১৬ হাজার একরে। জি কে সেচ প্রকল্পটির আওতাধীন ৪ জেলার কৃষকদের জমিতে সেচ সরবরাহের লক্ষ্যে সে সময়ই প্রকল্প এলাকায় খনন করা হয় ১৯৩ কিলোমিটার প্রধান সেচ খাল, ৪৬৭ কিলোমিটার শাখা খাল, ৯৯৫ কিলোমিটার উপশাখা খাল, ৯৭১ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল। নির্মাণ করা হয় ২ হাজার ১৮৪টি জলকাঠামো। এই প্রকল্পটি চালু রাখতে প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পরও প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ কৃষক এই সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্পের শাখা-উপশাখা ও নিষ্কাশন খালগুলো পলি ধারা ভরাট হয়ে যাওয়াকে দায়ী করছে কৃষকরা। ফলে নিজেরাই ইঞ্জিনচালিত টিউবওয়েল বসিয়ে জমিতে সেচ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ব্যাপক আবাদি জমিতে পানির চাহিদা ভূগর্ভস্থ থেকে তুলে জমিতে দেয়াতে পানির স্তর ক্রমে গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদাসীনতার কারণে জি কের অধীনে বিভিন্ন ছোট বড় ক্যানাল খনন কাজ না করায় ভরাট হয়ে গেছে ক্যানেলগুলো। পানি চলাচল না করায় অবৈধ দখলদারদের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ক্যানেলগুলো। ফলে পানির অভাবে থমকে গেছে চাষিদের মাঠের বোরো চাষসহ কয়েক হাজার একর ফসলের আবাদ। এরপরও এ বিভাগটি কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।  
  
দক্ষ জনবল না থাকায় এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তথা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে প্রকল্পের কাক্সিক্ষত সুবিধা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হচ্ছে না। তবে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে জি কের আওতাধীন লাখ লাখ কৃষক সেচ সুবিধা পাবে। আবাদ হবে লাখ লাখ হেক্টর জমি।  
  
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে কুষ্টিয়া অঞ্চলের মাত্র ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা দেয়ার পরিকল্পনা করলেও খাল ভরাট হওয়ায় তা ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জি কে সেচ প্রকল্পের অধীনে ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি অনাবাদি থেকে যাচ্ছে। তবে পরিকল্পনা মাফিক জি কে খালের উন্নয়নে কাজ করলে এ প্রকল্প জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারে।  
  
প্রকল্পের শুরুতে ‘আমন’ ফসলকে প্রধান ফসল হিসেবে গণ্য করে শুধুমাত্র আমন ও আউসের ওপর গুরুত্ব দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বর্তমানে বোরো ফসল প্রধান। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকল্পের পরিকল্পনা পরিবর্তন করার দাবি উত্থাপিত হয়ে এসেছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকে। অবশেষে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বোধোদয় হয়েছে এবং গত ৩ বছর যাবৎ বোরো মৌসুমেও সেচ সরবরাহ দেয়া হচ্ছে বলে কৃষকদের কাছ থেকে জানা গেছে। কৃষকরা আরো জানিয়েছে, বোরো মৌসুমে পানি সরবরাহ হলেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এখনো গড়ে ওঠেনি। সঠিক সময়ে সঠিক স্থানসমূহে পানি পাওয়া যাচ্ছে না আবার যেখানে চৈতালী ফসল আছে সেখানে পানি প্রয়োজন না থাকলেও সেখানে সেচ সরবরাহ করা হচ্ছে ফলে চৈতালী ফসলের ক্ষতি হচ্ছে।  
  
এসব অভিযোগ নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, পুরনো এই প্রকল্পটি ষাটের দশকে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর মাঝখানে একবার মাত্র সংস্কার কাজ হয়েছে। কিন্তু যদি ১০-১৫ বছর পর পর সংস্কার হয় তাহলে এত সমস্যা থাকে না। সংস্কার না হওয়ার কারণে বিভিন্ন খাল ভরাট, বেদখল, গেটসমূহ অকেজো হওয়ায় প্রকল্পের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে ৭১ সালের সংঘটিত রণক্ষেত্র বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কামারপাড়ার রণক্ষেত্রে বর্ধভুমি পরিদর্শন করি । ইতিহাস কে জানতে হলে যুদ্ধ ক্ষেত্র কে জানতে হবে । বাংলা মাতৃকার তিন বীর সেনানী শহীদ হয়েছিল

১। শহীদ সিপাহী মহিউদ্দিন

২। শহীদ ডাঃ আব্দুর রশিদ(ডাঃ হিলমেন)

৩। শহীদ মনির উদ্দিন(চুরিওয়ালা)

এবং ৪ জন পাক সেনা ও ২ জন বিহারী।

# মিরপুর উপজেলা হানাদার মুক্ত দিবস

জানা যায়, ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিরপুর উপজেলা সভাপতি আফতাব উদ্দিন খানের নেতৃত্বে শতাধিক মুক্তিকামী ছাত্রজনতা বর্তমান মাহমুদা চৌধুরী কলেজ রোডের পোস্ট অফিস সংলগ্ন মসজিদে শপথ গ্রহণ করেন।

৩০ মার্চ শেষ রাতে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর জিলা স্কুলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু হলে হানাদার বাহিনী নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে যশোর সেনানিবাসের সাহায্য চায়। কিন্তু সেখান থেকে সাহায্যের কোনো সংকেত না পেয়ে হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে তিনটি গাড়িতে করে গুলিবর্ষণ করতে করতে যশোর সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়।

পথে ঝিনাইদহ জেলার গাড়াগঞ্জের কাছে রাস্তা কেটে তৈরি করা মুক্তিবাহিনীর ফাঁদে পড়ে যায় পাক সৈন্যদের দু’টি গাড়ি। এসময় ওই এলাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয় তারা। হানাদার বাহিনীর ছয় সদস্য ভোরে জিলা স্কুল থেকে মিরপুরের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। এসময় তারা মশান বাজার সংলগ্ন মাঠের মধ্যে তীব্র প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে। সেসময় গুলি চালালে মশানের ডা. আব্দুর রশিদ হিলম্যান, গোলাপ শেখ, আশরাফ আলী ও সোনাউল্লাহ শহীদ হন। মিরপুর থানার কামারপাড়ায় বিছিন্নভাবে তিন হানাদারের সঙ্গে স্থানীয় মুক্তিকামীদের ৩১ মার্চ,১৯৭১ আবারও যুদ্ধ হয়।পাশে একটি বরিশাল নদী আছে। এ যুদ্ধে মিরপুর থানার সিপাহী মহিউদ্দিন, শহীদ মনির উদ্দিন(চুরিওয়ালা) শহীদ হন। আজ ২২ সেপ্টেম্বর২০১৯ তারিখে সরজমিনে উক্ত জায়গা পরিদর্শন করে গুরুত্বপুণ ইতিহাস জানতে পারি, আমার সাথে ছিলেন শাহ আলম প্রধান শিক্ষক, ফুলবা‌ডিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোঃ আব্দুল মান্নান মহন, প্রধান শিক্ষক, কা‌মির হাট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ সামসুল হক, প্রধান শিক্ষক ( ভারপ্রাপ্ত)ধুবইল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রত্যেক্ষ দর্শী জনাব মো: মুক্তার হোসেন জনি যুদ্ধের জায়গাগুলি সরজমিনে দেখান এবং তৎকালিন যুদ্ধের কাহিনী বর্ননা করেন, জায়গাটি হল বারইপাড়া ইউপি, ফুলবাডিয়া ইউপির সংযোগ স্থান, অপর পক্ষে হানাদার বাহিনীর ওই তিন সদস্যও নিহত হয়। শহীদ সিপাহী মহিউদ্দিনের কবরের পাশে মিরপুর উপজেলার শহীদ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর ভোরে ই-৯ এর গ্রুপ কমান্ডার আফতাব উদ্দিন খান ১৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মিরপুর থানায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গান স্যালুটের মাধ্যমে উত্তোলন করেন। এর পর ৬৫ জন হানাদার বাহিনীর দোসর ও রাজাকার পাহাড়পুর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করে। মিরপুর হানাদারমুক্ত হওয়ার সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ১৯৭১ সালের এই দিনে বিভিন্ন বয়সের হাজারো নারী-পুরুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ উল্লাস করতে থাকে।পরিশেষে মিরপুর উপজেলা মুক্ত হয়। আসুন আমরা সবাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মুক্ত যুদ্ধ কে জানি।